হাকিক্বতে সুন্নত বিদ'আত ও রুসুমাত

মুফতী আলী হোসাইন

লেখকের কথা

জাতি আজ বিদ'আত ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রতিনিয়ত বাতিলের প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলেছে। সাথে সাথে হকের পথ সংকীর্ণ ও রুদ্ধ হয়ে আসছে। সাধারণ মানুষ হতে শুরু করে আলেমরা পর্যন্ত বিদ'আতকে সুন্নত ও ফযিলাতের কাজ বলে মনে করছে। বাতিল কে হক, অন্ধাকরকে আলো এবং কুপথকে সুপথ মনে করে অন্ধের যষ্ঠির মতো আঁকড়ে ধরছে।

বিদ'আত ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে দ্বীনের ধারক-বাহকগণ আজ দিশেহারা। এমতাবস্থায় বিদ'আতীদের বিদ'আত ও শিরকের ব্যবসা আরো গতিশীল হচ্ছে। পীরগণ সুন্নত বর্জন করে বিদ'আতকে আঁকড়ে ধরছে। সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছ হতে হেদায়েত ও দ্বীনের নামে গোমরাহী ও বদ-দ্বীন গ্রহণ করছে।

আজ ইসলামের নাম আছে, আমল নেই, কারুকার্যখচিত ইট পাথরের মসজিদ আছে, হেদায়েত নেই। দ্বীন দিয়ে মানুষ আজ দুনিয়া ক্রয় করছে। আলেমগণ নিকৃষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। একথাগুলো কোন সাধারণ কথা নয়। সবই মহানবী (স.) এর মুখ নিঃসৃত বাণী। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হচ্ছে।

এহেন পরিস্থিতিতে সুন্নতের আলো প্রজ্জলিত করে বিদ'আতের অন্ধকার দুর করার লক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে হাকিক্বতে সুন্নত বিদ'আত ও রুসুমাত। এটি বান্দার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আশা করি উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে কেয়ামতের দিন নাজাতের ওসিলা করে দিন।

আমীন।।

(বান্দা আলী হোসাইন)

বিন্যাস পত্র

নং	কি	কোথায়

****

রসূল (স.) এর সুন্নাত

নবী করীম (স.) সুন্নতকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরার জন্য অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। বিদ'আত তথা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হয়ে সুন্নত বর্জনের প্রতি অত্যধিক ভীতি প্রদর্শন করতঃ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) এর বর্ণনাতে তার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি রসূলে করীম (স.) হতে বর্ণনা করেনঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ

(مُسْتَدْرَك ـ جـ ١ ـ ص. ٩٣)

অর্থাৎ তোমাদের জন্য আমার সুন্নত এবং আমার আদর্শে আদর্শবান খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে স্বীয় অভ্যাসে পরিণত করা আবশ্যক। ইহা স্বীয় মাড়ির দাঁতের দ্বারা মজবুত করে আঁকড়ে ধরো এবং নব আবিষ্কৃত কর্ম হতে বিরত থাক। কেননা শরীয়তের মধ্যে প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বস্তু বিদ'আত।

(মুসতাদরিকঃ খন্ড১, পৃ ৯৬)

এ বিশুদ্ধ বর্ণনাতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রতিটি উম্মতের জন্য রসুল (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা কর্তব্য। আর যেহেতু প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী, তাই সর্ব প্রকার নব-আবিষ্কৃত বিদ'আত পরিহার করা আবশ্যক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসুলে করীম (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে ইরশাদ করেন :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوا اَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهٖ صلعم (مستدرك)

হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে গেলাম। যদি তোমরা সে দুটি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তবে কোন অবস্থাতেই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তার মধ্যে একটি হলো আল্লাহর কিতাব, অপরটি তাঁর নবীর সুন্নত। (মুসতাদরিক)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, চার প্রকার মানুষ আমার এবং আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশপ্ত। তার মধ্যে এক প্রকার হলো اَلتَّارِكُ لِسُنَّتِيْ (আমার সুন্নত বর্জনকারী)।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, একটি বিশেষ স্থানে রসুলে করীম (স.) বর্ণনা করেন فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ অর্থাৎ যে আমার সুন্নত (আদর্শ) হতে বিমুখ থাকল সে আমার (দলভূক্ত) নয় অর্থাৎ সে আমার উম্মত নয়। সুন্নত তরক কারীর জন্য এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে, যাকে রহমাতুল্লিল আলামীনের উম্মত হতে বহিস্কার করা হয়েছে।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) রসুলে করীম (স.) হতে বর্ণনা করেনঃ

تَكُوْنُ بَعْدِيْ أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهَدْيِيْ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ جُثْمَانِ اِنْسٍ

(مسلم شريف، جـ ٢، ص. ١٢٧)

অর্থাৎ আমার পরে কিছু পথ প্রদর্শক এমন হবে, যারা আমার আদর্শের উপর পরিচালিত হবে না এবং আমার আদর্শের উপর আমল করবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আকারে ইনসান এবং প্রকারে হবে শয়তান।

সুন্নতের অনুসরণের ব্যাপারে হাদীসের গ্রন্থে এতো বেশী বর্ণনা এসেছে যে, তার সঠিক সংখ্যা গণনা করা কষ্টকর। শুধু উদাহরণের জন্য উল্লিখিত বর্ণনা একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অনুধাবনের জন্য যথেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞাকারীদের কথা ভিন্ন। তাদের রোগমুক্তির ব্যবস্থা দুনিয়াতে নেই।
হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহ) লিখেছেন,

اِنْتِظَامُ الدِّيْنِ يَتَوَقَّفُ عَلٰى اِتِّبَاعِ سُنَنِ النَّبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حجة الله البالغة، جـ١، ص. ١٧٠)

অর্থাৎ দ্বীনের সুব্যবস্থাপনা রসূল করীম (স.) এর আদর্শ অনুসরণের মধ্যে নিহিত। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাঃ পৃ. ১/১৭০)

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত

নবী করীম (স.) এর আদর্শে আদর্শবান সাহাবায়ে কেরামগণ উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য সর্বদা উদাহরণীয়। তাই রসূলে করীম (স.) তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করার সাথে সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকেও আঁকড়ে ধরার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) রসূলে করমী (স.) থেকে বর্ণনা করেনঃ

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (ترمذى . ص ٩٢)

অর্থাৎ যে আমার পরে জীবিত থাকবে সে অনেক মতানৈক্য অবলোকন করবে। সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যক আমার এবং হেদায়েত প্রাপ্ত আমার খোলাফায়ে রাশেদীনদের আদর্শকে মজবুত করে আকড়ে ধরবে, মাড়ির দাঁতের দ্বারা আকড়ে ধরবে (যাতে ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে) আর শরীয়তের নব-আবিস্কৃত বস্তু থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, (শরীয়তের মধ্যে) প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বস্তুই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা। (তিরমিজী শরীফঃ ২/৯২)

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয়। কেননা তাঁরা রসূলের সুন্নতেরই অনুসারী ছিলেন।

فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوْا إِلَّا بِسُنَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِمْ إِمَّا بِعَمَلِهِمْ بِهَا أَوْ لِإِسْتِنْبَاطِهِمْ وَ اِخْتِيَارِهِمْ إِيَّاهُ (مرقات. ١ ص. ٣٠)

অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনগণ যথার্থভাবে রসূলে করীম (স.) এর সুন্নতের উপর আমল করেছিলেন। সুতরাং সুন্নতের সম্বন্ধ তাদের প্রতি হওয়ার কারণ হলো, তাঁরা সুন্নতের উপর আমল করেছেন অথবা ইজতিহাদ করে তা অবলম্বন করেছেন। (মিরকাতঃ ২/ ৩০)

উল্লিখিত হাদিসের ব্যখ্যা হতে বুঝা গেল খোলাফায়ে রাশেদীনদের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা যে কাজ কে তারা পছন্দ করেছেন তাও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত এবং রসূলে করীম (স.)এর বর্ণনা মতে উম্মতের জন্য তাঁদের আদর্শকে আকড়ে ধরা অপরিহার্য। আর প্রত্যাখ্যান করা পথ ভ্রষ্টতা। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

> যে বিষয়ের প্রতি খোলাফায়ে রাশেদীন আদেশ করেছেন যদিও তা তাদের উন্নত চিন্তা ও ইজতিহাদদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাও সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত। এটিকে বিদ'আত বলে আখ্যা দেয়া আদৌ সমীচিন নয়। বরং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় এমন আখ্যা দিয়ে থাকে। (আশিয়্যাতুল লুময়াতঃ ১/১৩০ পৃ.)

হাফেজ ইবনে রজব আলী হাম্বলী (রহ.) বলেনঃ

وَالسُّنَّةُ هِيَ الطَّرِيْقُ الْمَسْلُوْكُ فَيَشْمِلُ ذٰلِكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُــوَ وَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ مِنَ الْإِعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَــالِ وَالْأَقْــوالِ وَ هٰــذِهِ هِيَ السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ (جامع العلوم . ج ١ ص. ١٩١)

অর্থাৎ সুন্নত এমন পথের নাম যার উপর পায়চারি করা হয়। সুতরাং ইহার অন্তর্ভূক্ত দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধারার ঐ পথ যার উপর রসূলে করীম (স.) ও তাঁর বিশিষ্ট অনুচর খোলাফায়ে রাশেদীন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চাই তা বিশ্বাস, কার্যে পরিণত ও কথাবার্তার পর্যায়ে হোক না কেন, এটিই পুরিপূর্ণ সুন্নত। (জামেউল উলুমঃ ১/১৯১)

যদিও সুন্নতের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের বাণী এবং আমলের উপর হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ সুন্নত তা-ই যা বর্ণিত হয়েছে। এজন্য হযরত আব্দুল কাদের জিলানী হাম্বলী (রহ.) আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেঃ

فَعَلَى الْمُؤْمِنِ إِتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمَاعَةُ مَا إِتَّفَقَ عَلَيْــهِ الصَّحَابَــةُ فِــى خِلَافَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ (غنية الطالبين . صـ ١٧٠)

অর্থাৎ মোমেনের উপর কর্তব্য হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুসরণ করা। আর সুন্নত বলে যা রাসূল করীম (স.) হতে প্রমাণিত হয়েছে এবং জামায়াত বলে যার উপর সাহাবায়ে কেরাম খোলাফায়ে রাশেদাদের যুগে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (গুনিয়াতুত্ব ত্বালেবীনঃ ১৭০পৃ)

মূলত এরা হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সেই দল যারা সর্বপ্রকার বিদ'আত হতে মুক্ত।

আল্লামা সায়্যেদ সনদ আলী ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী হানাফী (রহ.) বলেনঃ

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَذْهَبُهُمْ خَالٍ عَنْ بِدَعِ هٰؤُلَاءِ (شرح مواقف، راه سنت، ٢١)

অর্থাৎ একমাত্র আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদাই সর্ব প্রকার বিদআত হতে মুক্ত। (শরহে মাওয়াক্বেফ, রাহে সুন্নাতঃ ২১)

উপরের আলোচনা হতে এটিই বোঝা গেল, যে খোলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত পথ, রসূল (স.) এর অনুসৃত পথের ন্যায় শরীয়তের দলীল হিসেবে সাব্যস্ত, যার অনুসরণ উম্মতের জন্য আবশ্যক।

খোলাফায়ে রাশেদাদের যুগে যে বিষয়ের উপর ইজমা হয়েছে তাই হলো জামাত। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা সমর্থন করা ব্যতীত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অর্থ পরিপূর্ণ হবে না। কেননা রসূল (স.) এর সংশ্রবপ্রাপ্ত প্রত্যেক সাহাবী স্বীয় স্থানে হেদায়েতের সূর্যের সুউজ্জ্বল রশ্মি এবং ইলমের আকাশের নূরানী নক্ষত্র। কিন্তু একথা কোন ভাবে অস্বীকার করা যাবে না যে, রসূল করীম (স.) হতে যে বরকত খোলাফায়ে রাশেদীনগণ অর্জন করেছিলেন, সামষ্টিক দিকে লক্ষ্য করে বলা যায় তা অন্য কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এভাবে তাদের পবিত্র অস্তিত্ব দ্বারা আল্লাহ তায়ালার এ পবিত্র ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِىْ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (جزء ١٨)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে আল্লাহ তাদের কে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন ও কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এর পর যারা অকৃতজ্ঞ

এ আয়াতটি এক দিকে যেমন রসূল (স.) এর নবুওতের প্রমান বহন করে অন্যদিকে তেমন তাঁর নিবিড় অনুসারী সাহাবায়ে কেরামগণের মার্যাদা প্রকাশকারী। কেননা আয়াতের ভবিষ্যদ্বানী তাদের যুগে হুবহু পরিপূর্ণ হয়েছে।

সত্য কথা এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যে সব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ পাক এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, সে সব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে অধিকরূপে বিদ্যমান ছিল। আবার আল্লাহর ওয়াদাও পরিপূর্ণরূপে তাদের কাজ-কর্মে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরবর্তী যুগে সেই ঈমান ও সৎকর্ম আর পরিদৃষ্ট হয়নি। সেইরূপ দেশ শাসন ও রাজত্ব করার গাম্ভীর্যও আর পরিদৃষ্ট হয় নি। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সেই গৌরবময় ঐতিহ্য আর ফিরে আসেনি।

খাইরুল কুরুনের ঐক্যমত

খাইরুল কুরুন বলা হয় সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীনদের যুগকে। সহাবায়ে কেরামগণের পরে তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীনদের অধিকাংশ সদস্য যদি কোন কাজ অস্বীকার না করে গ্রহর করে অথবা ছেড়ে দেয় তাও শরীয়তের দলীল হিসাবে গৃহীত হবে। কারণ খাইরুল কুরুনের আমল শরয়ী দলীল হওয়াটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলোঃ হযরত ইবনে মাসউদ রসূলে করীম (স.) হতে বর্ণনা করেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْئُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ (بخاري ، جـ ١ ، ص ٣٦٢)

অর্থাৎ আমার যুগের মানুষ সর্বোত্তম। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের মানুষ (তাবেয়ী) অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের মানুষ (তাবে- তাবেয়ীন)। অতঃপর এমন সম্প্রদায়ের

আবির্ভাব হবে যাদের সাক্ষ্য কসম কে এবং কসম সাক্ষ্য কে অতিক্রম করবে। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলে করীম (স.) হতে বর্ণনা করেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ تَأْتِىْ قَوْمٌ يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْئَلُوْهَا (مستدرك ، جـ ٣ ، ص ٤٨١)

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ। অতপর তৎপরবর্তী যুগের মানুষ অতপর তৎপরবর্তী যুগের মানুষ। অতপর এমন সম্পদায় আবির্ভূত হবে যে, তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া ব্যতীত সাক্ষ্য প্রদান করবে।

(মুসতাদরিকঃ খ. ৩, পৃ. ৪৮১)

আলোচ্য বর্ণনা হতে বুঝা গেল যে, খাইরুল কুরুনের পর দুনিয়াতে যারা আগমন করবে তাদের মধ্যে দ্বীনের সে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না যা খাইরুল কুরুনের মধ্যে ছিল। মিথ্যার প্রচলন তাদের মধ্যে অধিক হবে। কথায় কথায় কসম খাবে, অকারণে সাক্ষ্য প্রদান করবে, আমানত দারীর প্রতি গুরুত্ব থাকবে না, খেয়ানত তাদের পেশা রূপে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ নৈতিক ও আত্মিক অধঃপতরেন নিম্ন স্তরে পৌছে যাবে।

এটি নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে, আমানতদারী, সততা এবং সত্যকে গ্রহণ করার যে উৎসাহ ও উদ্দিপনা খাইরুল কুরুনের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাঁদের পরের যুগের মানুষের মাঝে তা সেরূপভাবে পরিদর্শিত হয় না। মিথ্যা, খেয়ানত, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানসহ এমন সব বিদআত আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দ্বীন ইসলামের বুকে কুঠারাঘাত হেনেছে। কেননা প্রতিটি বিদ'আত এসে আসন গেড়েছে সুন্নতের স্থানে। তবে খাইরুল কুরুনে যে বিদআত স্থান পায়নি তা নয়। কিন্তু সে বিদআত পরের ফেতনা হতে নগণ্য ছিল এবং অধিকাংশ মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সাথে সাথে সেই ফিতনা ও বিদআতের মূলৎপাটনে তারা নিজেদের জীবনকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেনি। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষের মাঝে দ্বীনি উৎসাহ- উদ্দীপনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন,

سَأَلَ رَجُلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرُ قَالَ اَلْقَرْنُ الَّذِىْ اَنَا فِيْهِ ثُمَّ الثَّانِىْ ثُمَّ الثَّالِثُ (مسلم. جـ٣. ٣١٠)

এক ব্যক্তি রসূলে করীম (স.) কে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? উত্তরে রসূলে করীম (স.) বলেন, আমার যুগের মানুষ, অতপর তার পরের যুগের মানুষ অতঃপর তার পরের যুগের মানুষ। (মুসলিমঃ খন্ড ৩, পৃ.৩১০)

অর্থাৎ রাসূল (স.) এর পরে সর্বোত্তম মানুষ হলো সাহাবায়ে কেরাম। তারপর দ্বিতীয় যুগের মানুষ (তাবেয়ীন) তার পর তাবে তাবেয়ীন।
ইমাম মুহিউদ্দীন আবু জাকারিয়া ইয়াহ হিয়া বিন শরফ আন্-নববী খাইরুল কুরুনের হাদীসের ব্যাখ্যায় قرن শব্দের অনেক অর্থ উল্লেখ করে পরিশেষে লিখেছেনঃ

وَالصَّحِيْحُ اَنَّ قَرْنَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّحَابَةُ وَالثَّانِىْ اَلتَّابِعُوْنَ وَالثَّالِثُ تَابِعُوْهُمْ . (شرح مسلم، جـ ٢، ص ٣٠٩)

এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো রসূলে করীম (স.) এর যুগ হতে সাহাবীদের যুগ, তারপর তাবেয়ীদের যুগ এবং তার পরে তাবে- তাবেয়ীদের যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।
প্রখ্যাত ইসলামী ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবনু খালদুন আল মাগরেবী বলেনঃ

هَذَا هُوَ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِ اَفْعَالُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ فَهُمْ خِيَارُ الْأُمَّةِ وَ إِذَا جَعَلْنَا هُمْ عُرْضَةُ الْقَدْحِ فَمَنْ الَّذِىْ يَخْتَصُّ بِالْعَدَالَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ثُمَّ يَفْشُوْ الْكِذْبِ فَجَعَلَ الْخَيْرَةُ وَهِىَ الْعَدَالَةُ مُخْتَصَّةً بِالْقَرْنِ الْاَوَّلِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَعُوْدَ نَفْسَكَ اَوْ لِسَانَكَ اَلتَّعَرُّضَ لِاَحَدٍ مِنْهُمْ. (مقدمة ابن خلدون: ص ٣١٨)

আর (পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য) এটা উচিৎ যে, সালফ তথা সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনদের কার্যকলাপকে ধারণ করা। কারণ তাঁরা ছিলেন উত্তম জাতির অন্তর্ভূক্ত। যদি আমরা তাদেরকে তিরষ্কারের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করি, তবে ন্যয়-নীতির বিশেষণে কে বিশেষিত হবে? অথচ নবী করীম (স.) বলেন, সর্বোত্তম

যুগ আমার যুগ, অতঃপর সেই যুগ যা তার সাথে মিলিত হয়েছে। রসূল করীম (স.) এই কথা (সেই যুগ যা তার সাথে মিলিত হয়েছে) দুই বার অথবা তিনবার উল্লেখ করেছেন। অতঃপর মিথ্যার প্রচলন আধিকহারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। রাসূল (স.) ইনসাফ ও ন্যয়নীতিকে সর্বোত্তম যুগের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। এই সীমাবদ্ধতা প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং হুঁশিয়ার! তাদের সম্পর্কে অন্তরে মন্দ ধারণা এবং মুখে খারাপ শব্দ কখনো প্রকাশ করো না।

(মোকাদ্দামা ইবনে খালদুনঃ পৃ. ২১৮)

অতএব জানা গেল যে, খাইরুল কুরুন তিনটি। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামদের যুগ, তাবেয়ীনদের যুগ এবং তাবে-তাবেয়ীনদের যুগ। তবকায়ে রিজালের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, তাবে তাবেয়ীনদের যুগ ২২০ হিজরী পর্যন্ত ছিল। এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ এমন ছিল যে, তাদের অনুসরণে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। তাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাদের অন্তর ছিল পরিচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ, কৃত্রিমতার দাগ তাদের মধ্যে তেমন ছিল না। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবীর সাহচর্য এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ বলেনঃ

> সুতরাং তোমরা সকলে তাঁদের ফযীলাত ও মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাদের পদাঙ্কানুকরণ করে চলো এবং যথাসাধ্য তাদের আখলাক ও চরিত্র আঁকড়ে ধরো। কেননা তাঁরা সরল ও সঠিক পথে ছিলেন।

কাজেই এই তিন যুগে রাসূল (স.) এর আদর্শ ও শিক্ষার যে নমুনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা শরীয়ত হিসেবে স্বীকৃত। এই তিনটি স্তরের নীতিমালার ভিত্তিতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত। এর পরবর্তী যুগে প্রণীত যে কোন মতবাদ গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

০০০

কিয়াস

মহানবী (স.) এবিষয় সম্যক অবগত ছিলেন যে, যুগের চাহিদা অনুপাতে মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা সব সময় স্থির থাকবে না। বরং সামাজিক উন্নতির প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন ও সমস্যার পরিবর্তন একটি অনস্বীকার্য বিষয়। এজন্য তিনি আগত সমস্যার ভবিষ্যত সমাধান না দিয়ে তা তিনি উম্মতের মুজতাহিদ ব্যক্তিদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

এ কথা জানা যে, মুজতাহিদ ব্যক্তিরা সর্বদা কুরআন-হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক নিজেদেরকে পরিচালনা করে থাকেন। আর এসমস্ত ব্যক্তিদের অধিকার রয়েছে যে, তারা কুরআন-হাদীসের আলোকে মূলনীতি প্রণয়ন করে সে সমস্ত বিষয়ের সমাধান দিবেন যার সমাধান কুরআন হাদীসে স্পষ্ট নেই। তবে তাদের সেই ইজতিহাদ যেমস সঠিক হতে পারে তেমন ভুলও হতে পারে। ইজতিহাদ করার মত সার্বিক জ্ঞান থাকা ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কোন বিষয়ে ইজতিহাদ করলে তা ভুল হলেও তাতে তার গুনাহ হবে না। বরং সঠিক সমাধান অন্বেষণে স্বচেষ্ট হওয়ার কারণে তিনি সওয়াবের অধিকারী হবেন। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরাইরা (রা:) প্রমুখ সাহাবা গণ বর্ণনা করনেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَ إِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَ اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ، بخارى، ج ١، ١٠٩٢

রাসূলে করীম (স.) বলেন, কোন হাকিম যদি সর্ব শক্তি ব্যয় করে কোন সমস্যার মিমাংশা করে এবং তা সঠিক হয় তবে সে দ্বিগুর সওয়াব পাবে। আর যদি সম্যক চেষ্টা করে মিমাংশা করার পরও ভুল হয় তবে সে একটি সওয়াব পাবে।

(বুখারীঃ ১/১০৯২)

এর কারণ হলো আল্লাহর রাস্তায় পরিশ্রম করলে তা বিফলে যায় না।তাই ইজতেহাদ সঠিক হওয়ার কারণে দ্বিগুন (ইজতেহাদ করা এবং সঠিক হওয়ার কারণে) সওয়াব পাবে। আর সঠিক না হলে ইজতিহাদ করার কারণে একগুন সওয়াব পাবে। তবে এজন্য শর্ত হলো যিনি ইজতিহাদ করবেন তাকে সঠিক অর্থে মুজতাহিদ হতে হবে।

অর্থাৎ মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত আছে তা সব তার মধ্যে থাকতে হবে। অজ্ঞ মুজতাহিদ জাহান্নামে যাবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাতঃ ২/৩২৪)

আবার কিয়াস ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে পরিগণিত। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমামগণ তাই মনে করেন।

কিয়াস (قياس) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, অনুমান করা, সামঞ্জস্য পূর্ণ করা, সমন্বিত করা, যুক্তি করা ইত্যাদি। তবে ইসলামী আইন শাস্ত্রে কুরআন-হাদীসের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শরীয়তের সমস্যার সমাধান করার নাম কিয়াস।

মূলতঃ কিয়াস হচ্ছে আইনের বিস্তৃতি। মূল আইনে (কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে সাহাবা) যখন কোন সমস্যার সামাধান খুঁজে পাওয়া যায় না বা মুল আইনের শব্দাবলীতে সমস্যার সমাধান স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে না, তখন মুল আইনের উপর ভিত্তি করে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। এতে আইনে যে বিস্তৃতি ঘটে তাকেই কিয়াস বলে।

কিয়াস মূলত অনুসিদ্ধান্ত। মূল আইনে যা সুপ্ত আছে কিয়াস তার বিস্তৃতি ঘটায়। কিয়াস দ্বারা নতুন আইন সৃষ্টি হয় না, নতুন আইন অবিস্কার হয়। আইনের ভাষার মধ্যে যা লুকিয়ে থাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা তাকে টেনে এনে সুন্দর রূপ দেয়া হলো কিয়াসের কাজ। তাই এটি সৃষ্টি নয়, আবিস্কার। কিয়াস হলো তাই আইনের বিস্তৃতি। হানাফি উসূলবিদদের অভিমত এটিই। মালেকী আইনশাস্ত্রবিদদের মতে মুল আইন হতে ইল্লতের মাধ্যমে বা সূত্রে যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্তই হলো কিয়াস। আর শাফেয়ী ফকীহদের মতে একটি, পরিচিত জিনিসের সাথে অন্য পরিচিত জিনিস ইল্লতের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনের নাম কিয়াস। (محمد ابو زهرة اصول اللغة)

প্রকৃত পক্ষে যে বিষয় সম্পর্কিত বিধান কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাতে নেই সে জাতীয় বিষয় কুরআন সুন্নাহ ও ইজমাতে বর্ণিত কোন বিষয়ের বিধানের সাথে সাদৃশ্য রেখে নতুন বিধান উদ্ভাবন করার নাম কিয়াস।

নিম্নে কিয়াসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা প্রদত্ত হলোঃ

* হানাফী আইনজ্ঞদের মতেঃ

إِنَّهُ بَيَانُ حُكْمِ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوْصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ مَعْلُوْمٍ حُكْمُهُ بِالْكِتٰبِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ لِإِشْتِرَاكِهِ مَعَهُ فِى عِلَّةِ الْحُكْمِ .

কুরআন ও সুন্নাহ অথবা ইজমাতে বর্ণিত কোন বিধি সম্বলিত (منصوص) নির্দেশ এর

মাসয়ালার নির্দেশ বর্ণনার নামই কিয়াস। সংজ্ঞাটি অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।
আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন,

اَلْقِيَاسُ مُسَاوَاةُ مَحَلِّ الْاٰخَرِ فِى عِلَةِ حُكْمٍ لَهُ شَرْعِيٍّ لَا تُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ (كتاب التحرين)

আল্লামা সাদরুশ শরীয়াহ (রহ.) বলেছেনঃ

اَلْقِيَاسُ تَعْدِيَةُ حُكْمٍ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لَا تُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ فَهْمِ اللُّغَةِ(تنقيح الاصول)

আল্লামা ইবনে হাজির বলেনঃ

اَلْقِيَاسُ مُسَاوَاتُ فَرْعٍ لِأُصُوْلٍ فِيْ عِلَّةِ حُكْمِهِ (المختصر)

আল্লামা জুবায়দী বলেনঃ

اَلْقِيَاسُ اِثْبَاتُ مِثْلِ حُكْمِ مَعْلُوْمٍ فِي مَعْلُوْمٍ اٰخَرَ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِى عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْمُثْبِتِ(المنهاج)

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা কিয়াসের প্রমান প্রতিষ্ঠিত এবং পবিত্র কুরআনের ৩টি আয়াত দ্বারা কিয়াসের দলীল উপস্থাপন করা যায়। যথা-

- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَأْوِيْلًا . (سورة النساء)
- هُوَ الَّذِى اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ——— فَاعْتَبِرُوْا يَااُوْلِى الْاَبْصَارِ (سورة الحشر)
- قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ الخ

সুন্নাহ দ্বারাও কিয়াস প্রমাণিত। যেমন,

- حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ الَّذِىْ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَرَادَ اَنْ

يَبْعَثَ مَعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ كَيْفَ تَقْضِيْ اِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ اَقْضِي بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَائِيْ وَلَا اٰلُوْ قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى صَدْرِهٖ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضٰى بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

* وَوَرَدَ اَنَّ جَارِيَةً خَثْعَمِيَّةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ اَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا زَمِنًا لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّحُجَّ اِنْ حَجَجْتُ عَنْهُ اَيَنْفَعُهُ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلٰى اَبِيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهٖ اَكَانَ يَنْفَعُهُ ذٰلِكَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

এভাবে অনেক কিয়াস রসূল (স.) হতে বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখারজন্য اعلام الموقعين নামক কেতাব দেখা যেতে পারে।

আবার সাহাবাগণের কর্ম পদ্ধতিতে কিয়াসের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তারা কতেক আহকামকে কতেকের উপর কিয়াস করেছেন। যেমন হযরত আবু বকর (র.) এর নামাজের ইমামতিকে রাষ্ট্রের খলিফা হওয়ার কিয়াস করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম (রহ) সাহাবায়ে কেরামের অনেক কিয়াসী ফাতওয়া তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তা এড়িয়ে যাওয়া হলো।

০০০

সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের পরিচয়

সাহাবীঃ

যে ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় ঈমানের সাথে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও হুজুরে পাক (স.) এর সংস্পর্শ লাভ করেছেন, তাঁর পদাঙ্কনুসরণ করে চলেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবণর করেছেন তিনিই সাহবী। যেমন হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) প্রমুখ।

তাবেয়ীনঃ

তাবেয়ীন বলা হয় যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ সাহাবীদের অনুসরণ করেছেন। যেমন, হযরত হাসান বসরী, মুজাহেদ, আলকামা, ইকরামা (রহ.) প্রমুখ।

তাবে-তাবেয়ীঃ

যারা তাবেয়ীনদের অনুসরণ করেছেন তাদেরকে তাবে-তাবেয়ীন বলে। যেমন, ইমাম বুখারী, আবু বকর ইবনু আবী শায়বা, ইবনু জারীর প্রমুখ।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, শুধু দর্শন বা সংস্পর্শ লাভ করলেই হবে না; বরং আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সে অনুযায়ী কাজ-কর্ম করতে হবে। অর্থাৎ যদি কোন তাবেয়ীন সাহাবায়ে কেরামগণের অনুসরণ না করে, আর তাবে-তাবেয়ীন তাবেয়ীনদের অনুসরণ না করে, তবে তাঁরা ঐ নামে ভূষিত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যাক্তি রসূলে করীম (স.) এর সংস্পর্শে এসে ঈমান আনার পর তাঁর আদর্শকে বর্জন করে, তবে সে আর সাহাবী থাকে না। মনে রাখতে হবে হাদীসে যে তিন যুগের কথা বলা হয়েছে এ তিন বলতে উদ্দেশ্য হলো (اهل زمانه) তিন যুগের মানুষ, শুধু যুগ উদ্দেশ্য নয়। মিসবাহুল মুনির গ্রন্থে اهل زمان এর অর্থ الجيل من الناس। অর্থাৎ মানুষের সম্মিলিত উপস্থিতির যুগ। আর قرن শব্দের অর্থ ইমাম যুজায করেছেন اهل كل مدة كان فيها نبي او طبقة من اهل العلم অর্থাৎ ক্বরন বলা হয় এমন যুগকে যার মধ্যে নবী ছিলেন অথবা আহলে ইলমের একটি সম্মিলিত দল ছিলেন। শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) قرن এর অর্থ করেছেন اهل زمان واحد متقارب অর্থাৎ এক নিকটবর্তী যুগের লোক। রাসূল (স.) এর হাদীস خير الناس قرني দ্বারাও বুঝায় যায় قرن হলো ঐ যুগে বসবাসকারী মানুষের একটি দল। সুতরাং যারা সিরাতে মুস্তাকীম পরিত্যাগ করেছে তারা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না। তাদের অনুসরণ নয় বরং

সাহাবায়ে কেরামগণ সত্যের মাপকাটি

হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামগনের পরে সাহাবায়ে কেরামগণ হতে অধিক আবেদ, জাহেদ, মুত্তাকী এ উম্মতের মধ্যে অতিবাহিত হয়নি। এ কারণেই আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কেরামগণকে রসূল পরবর্তী যুগের জন্য অনুসরণীয় মাপকাঠি হিসেবে সনদ প্রদান করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ. (التوبة : ٢)

অর্থাৎ যারা সর্ব প্রথম হিজরতকারী এবং সাহায্যকারী এবং যাঁরা তাদের সঠিক ভাবে অনুসরণকারী আল্লাহ্ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও সবাই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। (তাওবাঃ ২)

আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং তাদের প্রকৃত অনুসারীদের উপর তাঁর স্থায়ী সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করেছেন। উক্ত আয়াতে কারীমায় আনসার ও মুহাজিরদের পুর্বের ও পরের সকলের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদের কথা উল্লেখ রয়েছে।

এক তাফসীরে والذين اتبعوهم এর ব্যাখ্যায় তাবিয়ীনগণকেও বুঝান হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে তাবেয়ীনগণও আল্লাহর সন্তুষ্টির সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। আর তাই মহানবী (স.) তাঁর সমস্ত সাহাবীগণকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) রসূলে করীম (স.) হতে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ تَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

(مشكوة المصابيح : ٣٠)

অর্থাৎ বনী ইস্রাইল সম্প্রদায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত হবে তেহাত্তর দলে বিভক্ত। সবকটি দলই জাহান্নামী হবে শুধু একটি মাত্র দল ছাড়া।

সাহাবাগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেটি (যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে) কোন দল? উত্তরে তিনি বল্লেন, এরা সেই দল যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের আদর্শের অনুসারী হবে। (মিশকাতঃ ৩০)

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণের তরীকা উম্মতের জন্য হেদায়েতের সুউজ্জ্বল মশাল এবং রসূলের ন্যায় সাহাবায়ে কেরমাগণের কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও আমলসমূহ উম্মতের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তাইতো রসূলে করীম (স.) তাঁর ও সাহাবীগণের আদর্শকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কাজেই সাহাবায়ে কেরামগণকে দ্বীন হতে পৃথক করে অথবা দ্বীনকে সাহাবায়ে কেরাম হতে পৃথক করে দেখার ও ভাবার প্রয়াস আদৌ সম্ভব নয়।

উক্ত হাদীস দ্বারা সাহাবায়ে কেরামগণের শুধু প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়নি; বরং তারা যে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সত্য-মিথ্যা যাচায়ের পরশ পাথর তাও প্রমাণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণের সততা, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও নিঃস্বার্থতা এমন গ্রহণীয় যে যার উপর আমল করা উম্মতের জন্য বাঞ্ছনীয়।

তাই সাহাবায়ে কেরামগণকে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন নেই। কেননা সে কাজ আল্লাহ ও তার রসূল করে গেছেন। যারা সাহাবায়ে কেরামগণকে যাচাই-বাছাই করার দুঃসাহস দেখায় তারা মূলত দ্বীনের দৃঢ় প্রাচীরকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত।
হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেনঃ

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ مُطْلَقًا لِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَ اِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ (مرقات)

অর্থাৎ সাহবায়ে কেরাম সবাই সম্পুর্ণভাবে নিষ্ঠাবান ও নির্ভরযোগ্য হওয়া কুরআন-হাদীস এবং গ্রহণযোগ্য ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। (মিরকাত)

সাহাবাকে কেরামগণ কোন ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করলে তার উপর আমল করা উম্মতের জন্য কর্তব্য।

হযরত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেনঃ

> সহাবায়ে কেরামগণের ঐক্যমতের অনুসরণ করা ওয়াজিব বরং সাহাবায়ে কেরামগণের ঐক্যমত অন্যান্য শক্তিশালী (কুরআন-হাদীসের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত) প্রমাণ সমূহের অন্যমত। (ইকামাতুদ দলীলঃ ৩ খন্ড, পৃ. ১৩০)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী বলেনঃ

إِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مُتَّفِقُوْنَ عَلٰى أَنَّ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ (فتح البارى) جـ ٣/ ص، ٢٦٦)

আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত এ বিষয়ের উপর একমত যে, সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা শরীয়তের দলীল। (ফতহুল বারীঃ ৩য় খন্ড, পৃ. ২৬৬)

সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা যে শরীয়তের দলীল তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। এখানে শুধু নমুনা হিসেবে দু একটি তুলে ধরা হলো মাত্র। এ দ্বারা এ বিষয়টির স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, কুরআন-হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমা দ্বীনের ব্যাপারে হক ও বাতিলকে পার্থক্য করার জন্য অমূল্য পরশ পাথর স্বরূপ।

○○

উম্মতের ইজমা

খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নত এবং সাহাবায়ে কেরামগণের ইজমার পর উম্মতে মোহাম্মদীর ইজমা তথা ঐক্যমত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতের প্রশংসার নিমিত্তে ইরশাদ করেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ (آل عمران : ٣)

তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণে তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের প্রতি আদেশ প্রদান করবে এবং অসৎ কাজ হতে (মানুষকে) বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (আলে ইমরানঃ ৩)

আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে শক্তিশালী উম্মত অথবা ধনাঢ্য উম্মত হিসেবে আখ্যা দেননি; বরং শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এটি এজন্য যে, দুনিয়াতে এ উম্মতের কাজ হলো মানুষকে সৎ কাজের প্রতি আদেশ করা এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা বা বিরত রাখা। শুধু মাত্র নিজ সম্পদায়ের জন্যই নয়; বরং ধরার বুকের সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা ও সফলতার জন্য এ উম্মতের সৃষ্টি।

সুন্নতের উপর আমলের ফযীলাত

সুন্নত বর্জনকারীকে রসূলে করীম (স.) যেমন ভীতি প্রদর্শন করেছেন, তেমন সুন্নতকে কঠোরভাবে ধারণকারীকে তার ফযীলাত বর্ণনা করে উৎসাহিত করেছেন। যেমন হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ، (رواه البيهقى)

রসূলে করীম (স.) বলেন, আমার উম্মতের ফাসাদের সময় (সুন্নত ছেড়ে পথ ভ্রষ্ঠ হওয়ার সময়) যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশত শহীদের সাওয়াব রয়েছে। (বায়হাকী)

অর্থাৎ ব্যাপকভাবে যখন মানুষ রসূল (স.) এর আদর্শ বর্জনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন রাসূল (স.) এর আদর্শ সমাজে বাস্তবায়িত করতে চতুর্মুখী বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে রাসূল (স.) এর আদর্শের উপর আমল করাও কষ্টকর হয়ে পড়বে; এমতাবস্থায় নফ্স ও শয়তানের সাথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়ে যে ব্যক্তি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস চালাবে তার জন্য একশত শহীদের সাওয়াব রয়েছে। এর কারণ এটিও হতে পারে যে, সুন্নতের উপর আমল কারী ব্যক্তির আত্মা বাতিলের আঘাতে শত শত বার শাহাদাতের সুধা পান করবে। তাই একশত শহীদের সাওয়াব প্রদান করা হবে।

হযরত বিলাল বিন হারিস মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেনঃ

مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ ترمذى ـ (مشكوة المصابيح ـ ٣٠)

রসূলুল্লাহ (স.)বলেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতসমূহের এমন কোন সুন্নতকে সঞ্জিবীত করলো যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়েগিয়েছিল, তার জন্য সে সকল লোকের

সাওয়াবের পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে, যারা এটা আমল করবে; অথচ তাদের সাওয়াব হতে কোন অংশ হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন বিদ'আত (গোমরাহীর নতুন পথ) সৃষ্টি করলো যাতে আল্লাহ ও তার রাসুল সন্তুষ্ট নন, তার জন্য সে সকল লোকের গোনাহের পরিমাণ গোনাহ রয়েছে, যারা এর উপর আমল করবে। অথচ এটা তাদের গোনাহের কোন অংশ হ্রাস করবে না।

(মিশকাতঃ পৃ. ৩০)

মহানবী (স.) এর আদর্শ চিরন্তন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য সুউজ্জ্বল রবিস্বরুপ। তাঁর আদর্শ আপন মহিমায় মহিয়ান। পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের সাথে তাঁর আদর্শের তুলনা চলে না। তাঁর আবির্ভাবের পর হেদায়েতের সকল পথ রহিত হয়ে যায়।

দারামীর (একটি) বর্ণনায় এসেছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاَ تَّبَعَنِىْ ۔ (مشكوة ۔ ٣٢)

সেই সত্বার কছম, যার অধিকারে মুহাম্মদ-এর জীবন রয়েছে, এমন সময় যদি তোমাদের কাছে মুছাও জাহির হতেন, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে, তাহলেও তোমরা নিশ্চয়ই সরল পথ হতে গোমরাহ হয়ে যেতে। এমন কি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুয়তের যুগ পেতেন তা হলে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। (মিশকাতঃ ৩২পৃ.)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তে মুহাম্মদী স্বয়ং সম্পূর্ণ।এতে নতুন বা পুরাতনের অন্য কোন মত ও পথের সংযোজন পরিত্যাজ্য।

প্রকৃত মুহব্বতকারী কে?

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রকৃত মহব্বতকারীর পরিচয়ের নিমিত্তে বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (آل عمران)

(হে মুহাম্মদ স.!) ঘোষণা করে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র মুহাব্বতের দাবীদার হও, তবে আমার অনুসরণ ও অনুকরণ কর, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে মুহাব্বত করবেন ও তোমাদের যাবতীয় পাপকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আলে ইমরান)

আলোচ্য আয়াতে কারীমা, এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, যদি কোন দল বা ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃত মালিককে ভালবাসার দাবীদার হয়, তবে তার জন্য আবশ্যক যে, সে তাকে রসূল (স.) এর অনুসরণের পরশ পাথরে যাচাই করবে। তাতে নির্ভেজাল ও ভেজাল প্রমাণিত হবে। ফলে অসত্য ও ভ্রান্ত পথের বেড়াজালে যারা আবদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে সত্য ও সঠিক পথের দিশারী মনে করছে তাদের ভুল ধারণা কেটে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে সমস্ত আমল যাদের বিনষ্ট হয়েছে; অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে। (সূরা কাহাফ)

নিম্নের হাদীস দ্বারা রাসূল (স.) এর প্রকৃত মুহাব্বত কারীদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ. (مشكوة. ٣٠)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বলনে, হে বৎস! তুমি যদি এরূপে সকাল-সন্ধ্যা কাটাতে পার যে, তোমার অন্তরে

সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত এবং যে আমার সুন্নতের অনুসরণ করবে, ভাল বাসবে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাত শরীফঃ ৩)

উল্লিখিত হাদীসে এ বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, নবী করীম (স.) এর সুন্নতকে মুহাব্বত করা নবী (স.) কে মুহব্বত করার উপকরণ। এ থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নতের অনুসরণ মানব জাতির জন্য কতগুরুত্ব পূর্ণ।

যারা মুসলমান হিসেবে দাবী করে অথচ রসূলে করীম (স.) এর আদর্শকে মানে না তারা এনামে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। এপ্রসঙ্গে হযরত আবু রাফে (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اَلْفَيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِيًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ أَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ، رواه ابو داؤد، مشكوة، ٢٩

রসূলে করীম (স.) বলেছেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এরূপ না দেখি, সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার নিকট আমার নির্দেশাবলীর কোন একটি নির্দেশ পৌছবে যাতে আমি কোন বিষয় আদেশ করেছি অথবা কোন বিষয় নিষেধ করেছি, তখন সে বলবে, আমি এসব কিছু জানিনা। আল্লাহর কিতাবে যা কিছু পাব তারই অনুসরণ করবো। (আহমদ, আবু দাউদ, মিশকাতঃ ২৯)।

আলোচ্য হাদীসে রসূলে করীম (স.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মুসলমান বলে দাবীদারদের মধ্যে এমন অজ্ঞ লোকও হবে, যারা হাদীসকে শরীয়তের দলীল নয় বলতেও দ্বিধাবোধ করবে না। অথচ কুরআন যেরূপ ওহী, হাদীসও সেরূপ ওহী। আল্লাহ পাক বলেছেন, রসূলে করীম (স.) দ্বীন সম্পর্কে কোন কথাই নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বলেন না। এব্যাপারে যা বলেন সবই ওহীর মাধ্যমে বলেন। (সূরা নাজম) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এখানে কুরআনে রসূল (স.) হুবহু জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর হাদীসের শব্দ সাধারণত তাঁর নিজের কিন্তু ভাব উভয় স্থলেই অহী।

আসল ব্যাপার হল, এ শ্রেণীর লিবাসী লোকেরা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাস করেছে বলে দাবী করলেও আমলের কষ্ট স্বীকার করতে বা আহকামের অনুসরণ করতে তারা আদৌ প্রস্তুত নয়। আর হাদীস তাদেরকে এতে বাধ্য করে। অর্থাৎ কুরআনে দ্বীন সম্পর্কে সকল বিষয়ের বর্ণনা থাকলেও আল্লাহ পাক প্রয়োজন অনুসারে অনেক বিষয় এতো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন, যা রসূল (স.) ব্যতীত অন্যদের পক্ষে অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই রসূলের অনুসরণকেই কুরআনের অনুসরণ বলে ঘোষণা দিয়েছে। রসূলের অনুসরণ ছাড়া কুরআনের অনুসরণ অসম্ভব।

সাহাবায়ে কেরামদের সুন্নত প্রীতির উদাহরণ

পারস্য বিজয়ী বীর হযরত হুজাইফা (রা.) যখন পারস্য সম্রাট কিসরার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন, তখন সম্রাট তাঁর সাথে আলোচনার জন্য আহবান জানান। তিনি যথা সময়ে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলেন। মেহমানের জন্য খাবার পরিবেশন করা হলো। তিনি আহার শুরু করলেন। আহারের মাঝে হঠাৎ তার হাত হতে কিছু খাদ্য নিচে পড়ে গেল। রসূল (স.) এর সুন্নতের উপর আমল করার জন্য তিনি পড়ে যাওয়া খাবার উঠাতে স্বচেস্ট হলেন। পাসে বসা ব্যক্তি তাকে ইশারা করে খাবার না উঠানোর জন্য বললেন এবং তিনি ইশারার মাধ্যমে এটিও বুঝিয়ে দিলেন যে, তাতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। কিন্তু তিনি সে নিষেধ শুনলেন না। বরং বললেন, أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِىْ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ؟ (আমি কি এ আহ্মকদের জন্য আমার প্রিয় মাহবুবের আদর্শ পরিহার করব?) অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন, এরা ভাল মনে করুক আর নাই করুক বা অমাকে উপহাস করুক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সে জন্য আমি আমার নবীর আদর্শকে পরিহার করতে পারি না। (সুবাহানাল্লাহ)

কত মজবুত ঈমান ছিল তাঁদের। তাঁরা রসূলের একটি ক্ষূদ্র সুন্নতকে পর্যন্ত পরিহার করতেন না। আর সে জন্যইতো তাঁরা মর্যাদার শীর্ষে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি পারস্য সম্রাটের দম্ভ ও অহংকার এমনভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে, রসুলে করীম (স.) বলেছিলেন, اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده (কিসরা যখন ধ্বংস হয়েছে এর পর আর কোন কিসরার উত্থান হবে না)।

সাহাবায়ে কেরাম সুন্নতের উপর আমল করে বিশ্ব শাসন করেছেন। অথচ আমরা রসূলের সুন্নতকে আমল করতে গিয়ে কে কি বলবে বা আমল করলে সমুহ ক্ষতি হবে বা ইসলামের শত্রুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবো ইত্যাদি ভেবে তা পরিত্যাগ করছি। কখনো কখনো তা প্রত্যাখ্যানও করছি। কত দূর্বল আমাদের ঈমান। সামান্য একটি নাড়া পড়লেই তা কচুর পাতার পানির মত টলমাটল করে।

০০০

আল্লাহ আমাদের ঈমান কে দৃঢ় করার তাওফিক দান করুন।

বিদ'আতের অর্থ ও তাৎপর্য

যে জিনিস কুরআন-হাদীস এবং ইজমা ও শরয়ী কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং রসূলে করীম (স. এর উত্তম চরিত্রের পরিপন্থী এমন কাজকে দ্বীন হিসাবে ধর্মের মধ্যে আবিষ্কার করাকে বিদ'আত বলে।

আল্লামা ফিরোজাবাদী (রহ.) লিখেছেনঃ

اَلْبِدْعَةُ بِالْكَسْرِ اَلْحَدَثُ فِى الدِّيْنِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ أَوْ مَا اسْتُحْدِثَ بَعْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ (قاموس، ج ٢، ٤)

অর্থাৎ বিদ'আত দ্বীনের মধ্যে এমন সব আবিষ্কৃত কাজকে বলে যা দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পরে উদ্ভাবন হয়েছে। অথবা এমন কাজকে বলে যা রসূলে করীম (স.) এর তিরোধানের পরে কুপ্রবৃত্তি এবং আমল হিসেবে প্রকাশ লাভ করেছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী এ ব্যাপারে বলেনঃ

اَلْبِدْعَةُ فِى الْمَذْهَبِ اِيْرَادُ قَوْلٍ لَمْ يَسْتَنَّ قَائِلُهَا أَوْ فَاعِلُهَا فِيْهِ بِصَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ وَ أَمَاثِلِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ وَ اُصُوْلِهَا الْمُتْقَنَةِ(مفردات قرآن. ٣٨)

মাযহাবের মধ্যে বিদ'আতের প্রয়োগ এমন কথার উপর হয়, যার ব্যক্তকারী বা আবিস্কারক শরীয়ত প্রণেতার সঠিক অনুসারী নয় এবং সে শরীয়তের প্রাথমিক উদাহরণীয় ও দৃঢ় নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। (মুফরাদাতে কুরআনঃ ৩৮ পৃ.)

মিসবাহুল লুগাত প্রণেতা বলেনঃ

> নমুনাহীন নব আবিস্কৃত এমন বস্তু বা বিশ্বাসকে বিদআত বলে, যা দ্বীনের মধ্যে নতুন প্রথা হিসেবে প্রচলন ঘটেছে এবং তা সত্যের তিন যুগের মধ্যে ছিল না।

ফরহাঙ্গে জাদীদ প্রণেতা বলেনঃ

> বিদআত অর্থ দ্বীনের নামে কু-প্রথা। আর বিদআতী বলে যে অধর্মকে ধর্ম বলে চালায়।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম শাওকানী (রহ) বিদ'আতের শরয়ী পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ

اَلْبِدْعَة اَصْلُهَا مَا اُحْدِثَ فِىْ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَ اُطْلِقَ فِى الشَّرْعِ عَلٰى مُقَابِلَةِ السُّنَّةِ فَتَكُوْنُ مَذْمُوْمَةً

বিদ'আত বলা হয় এমন নতুন আবিস্কৃত কাজ কিংবা কথাকে পূর্ববর্তী সমাজে যার কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। আর শরীয়াতের পরিভাষায় সুন্নতের পরিপন্থী জিনিসকে বিদ'আত বলা হয়। অতএব তা অবশ্যই নিন্দনীয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকেলানী' তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ ফতহুল বারীর ৪র্থ খন্ডের ২১০ নং পৃষ্ঠায় বিদ'আতের উল্লিখিত ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।
আল্লামা মুরতাদা আজজোবাইদী আল হানাফী বলেনঃ

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً اِنَّمَا يُرِيْدُ مَا خَالَفَ أُصُوْلَ الشَّرِيْعَةِ وَلَمْ يُوَافِقِ السُّنَّةَ(تاج العروس، ج ٥، ص ٢٧١)

অর্থাৎ প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বস্তু বিদআত, এ হাদীসের অর্থ হল, যে জিনিস শরীয়তের নিয়মের ব্যতিক্রম এবং সুন্নতের পরিপন্থী সেই সমস্ত কাজ। (তাজুল আরুস, ৫ খন্ড, পৃ. ২৭১)
হাফেজ ইবনে রজব বলেন,

اَلْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا اُحْدِثَ مِمَّا لاَ اَصْلَ لَهُ فِى الشَّرِيْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ اَمَّا مَا كَانَ لَهُ اَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا وَاِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً (جامع العلوم والحكم) ١٩٣

বিদ'আত মূলত বলা হয় এমন সব নব-আবিস্কৃত বস্তুকে যার ভিত্তির উপর শরীয়তের কোন প্রমাণ নেই। আর নব আবিস্কৃত কোন বস্তুর উপর যখন শরীয়তে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা বিদ'আত রুপে পরিগণিত নয়, যদিও তাকে আভিধানিক অর্থ হিসেবে বিদ'আত বলা হয়। (জামেউল উলুম ওয়াল হিকামঃ ১৯৩ পৃ.)

হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন, بديع السموات এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতের দ্বারা পূর্বের কোন দৃষ্টান্ত ও নমুনা ছাড়া আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর অভিধানে প্রত্যেক নতুন বস্তুকে বিদ'আত বলা হয়। বিদ'আত প্রধাণত দু প্রাকর।

এক. বিদ'আতে শরয়ীঃ যে কাজ সম্পর্কে রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة (প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বস্তু বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আত পথ ভ্রষ্ঠতা)

দুই. আভিধানিক অর্থে বিদ'আত যা প্রকৃত অর্থে বিদ'আত নয়। যেমন হযরত ওমর (রা.) তারাবীহের নামাজ জামাতে পড়তে দেখে বলেছিলেন, نعمت البدعة هذا। (কত সুন্দত নব আবিস্কৃত কাজ এটি)

০০

বিদ'আত কি

শরীয়তে এমন কিছু নতুন কাজ যার পূর্ণ অর্থ ও নমুনা ধর্মে নেই তাই- বিদ'আত। মূলত দ্বীন ইসলামে অভিনব কর্ম পন্থা নীতিকেই বিদ'আত বলা হয়। কোন নব-আবিস্কৃত কাজকে যদি ধর্মের কাজ হিসেবে প্রমাণ করা হয়, আর তাতে রসূলের কথায় বা কজে কোন সমর্থন না থাকে, সেটিকেই বিদ'আত নামে অভিহিত করা হয়।

আল্লামা শাতেবী (রহ.)তাঁর আল ইতেছাম কিতাবে বিদ'আতের অর্থ লিখেছেন, দৃষ্টান্তবিহীন কোন কাজ শরীয়তে প্রবর্তন করাই বিদআত। তিনি আরো বলেছেন, কোন নতুন কাজকে বিদআত তখনই বলা হবে, যখন তা দ্বীনি কাজ বলে মনে করা হবে অথচ তা শরীয়তের পরিপন্থী।

আরবীতে بدعة শব্দের শাব্দিক অর্থ, এমন কোন নতুন কাজ করা যার কোন নমুনা পূর্বে ছিল না। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেনঃ

> বিদ'আত যা কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হয়; কিংবা উম্মতে মুহাম্মদীর সালাফ তথা সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীন, ইজমা বা সর্ব সম্মত রায়ের বিরোধী হয়। চাই তা আকীদা সংক্রান্ত হোক বিংবা আমল সংক্রান্ত

বিদ'আতের উল্লিখিত পরিচয় একথা প্রমাণ করে যে, যে বিষয়গুলো শরীয়াত বিরোধী নয় এবং যা করতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করা হয় না তা শরয়ী বিদ'আত নয়। যেমন হাতে ঘড়ি পরা, বাস-ট্রেন-জাহাজে উঠা; বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা ইত্যাদি। কারণ এসব কাজ করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে বা নেকী হবে কেউ মনে করে না। যে সমস্ত কাজ বা অনুষ্ঠান সাওয়াবের কাজ বলে কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, সে সব কাজ বা অনুষ্ঠান সওয়াবের কাজ মনে করে পালন করার নামই বিদ'আত। ইমাম শাত্বিবী (রহ.) বলেন,

لَامَعْنَى لِلْبِدْعَةِ اِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْفِعْلُ فِى اِعْتِقَادِ الْمُبْتَدِعِ شَرْعًا وَلَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ .

বিদআত তখনই বলা হবে যখন বিদআতী কোন কাজকে শরয়ী কাজ বলে ধারণা করা হবে; অথচ তা মূলতঃ শরয়ী কাজ নয়। এ ছাড়া এর অন্য কোন অর্থ নেই। অর্থাৎ শরীয়তে সমর্থন নেই এমন কোন কাজকে শরয়ী কাজ বলে বিশ্বাস করে নেয়াই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বিদ'আত।

ইমাম শাত্বিবী আরো বলেনঃ

فَمِنْ هٰذَا الْمَعْنٰى سُمِّىَ الْعَمَلُ الَّذِىْ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ فِى الشَّرْعِ بِدْعَةً

একারণেই এমন কাজকে বিদ'আত নাম দেওয়া হয়েছে যে কাজের সমর্থনে শরীয়তে কোন দলীল নেই।

তিনি আরো বলেনঃ

فَالْبِدْعَةُ اِذَنْ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيْقَةٍ فِى الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٍ تُضَاهِى الشَّرْعِيَّةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوْكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِى التَّعَبُّدِ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ، (الاعتصام)

বিদআত বলা হয় দ্বীন ইসলামে এমন কর্মনীতি বা কর্মপন্থা চালু করা যা শরীয়তের পরিপন্থী এবং যা করে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই উদ্দেশ্য। (আল ইতিসাম)

বিদ'আতের পরিণাম

মহানবী (স.) শিরকের পর সবচেয়ে বেশী হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন বিদ'আত এবং বিদ'আতী হতে সতর্ক থাকার জন্য। বিদআত শরীয়তে বড় অন্যায় কাজ। কারণ বিদ'আতের দ্বারা দ্বীনের প্রকৃত পোশাক পরিবর্তন হয়ে যায়। দ্বীন বিকৃতরূপে প্রকাশ পায়। আসল-নকল ও বাতিলের মধ্যে কোন পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে দ্বীন ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। এ দুটি পদ্ধতির দ্বারা দ্বীন ক্রমশঃধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তার একটি হলো كتمان حق (প্রকৃত সত্যকে লুকিয়ে রাখা)। দ্বিতীয়টি হলো تلبيس حق و باطل (হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ)

এই কিত্মান এবং তালবীসের কারণে দ্বীন কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বস্তুতে পরিণত হয়। যার যা ইচছা ও পছন্দমত বিষয়কে দ্বীনের বিষয় বলে চালিয়ে দেয়; আবার ইচ্ছা মাফিক দ্বীনের কোন বিষয়কে দ্বীন হতে বিতাড়ন করে।

দ্বীনের অভ্যন্তরে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটলে, সে দ্বীন তখন আর আল্লাহর মনোনীত দ্বীন থাকে না। বরং বাচ্চাদের খেলাঘরে পরিণত হয়। এটি মনে রাখা দরকার যে, কোন কাজ সওয়াবের অথবা গোনাহের হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া একমাত্র আল্লাহর কাজ। আর তা মানুষের নিকট পৌছে দেয়া ও বর্ণনা করা নবী ও রাসুলগণের কাজ। কোন কাজকে সাওয়াবের অথবা গোনাহের বলে ঘোষণা করার অর্থ নিজেকে খোদায়ী দাবী ও রিসালাতের মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করার নামান্তর।

আল্লাহ তা'আলা রসূলে করীম (স.) কে পরিপুর্ণ ও উত্তম আদর্শরূপে মানুষের মাঝে প্রেরণ করেছেন। সাথে সাথে মানুষকে তাঁর প্রত্যেক কাজ-কর্ম, আদেশ-নিষেধ (নুবওতের সাথে সম্পৃক্ত ধর্মীয় কাজে) মেনে চলার জন্য আদেশ প্রদান করেছেন। মানুষকে শরীয়তের কাজ করার ব্যাপারে তাদের পছন্দের উপর ছেড়ে দেননি। যেমন ইরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا (احزاب)

যারা আল্লাহর (নৈকট্য লাভ) ও শেষ দিবসে (ভাল প্রতিফল পাবার) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য রসুলুল্লাহর মধ্যে (জীবন চরিতে) রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সুরা আহযাব)

এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা রসূলে করীম (স.) এর পবিত্র আদর্শকে উদাহরণীয় রূপে সৃষ্টি করে আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় তাঁর পদাঙ্কানুকরণ করতে তাকিদ দিয়েছেন।

যারা সুন্নত তথা রসুলে করীম (স.) এর আদর্শ বিরোধী কাজ করে, অন্য কথায় যারা বিদআত কাজে অভ্যস্ত তারা আসলে মুসলিম নামে পরিচিত হবার যোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, من رغب عن سنتي فليس مني যে আমার সুন্নত হতে বিমূখ হবে সে আমার দলভূক্ত নয়।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শরীয়তে নুতন কোন কাজ ও আমলকে সাওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দিলে তা বিদ'আত রূপে বিবেচিত হবে। যে দ্বীনের মধ্যে বিদআত কাজের অনুপ্রবেশ ঘটাবে সে উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভূক্ত নয়। অনেক ভাল কাজ করলেও তা গৃহিত হবে না। এমনকি তাকে সম্মান প্রদর্শন করাও নিষিদ্ধ। নবী করীম (স.) বলেনঃ

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ

যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান প্রদর্শন করলো সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করলো।

হযরত আবু হাতেম খুজারী (রা.), হযরত আবী উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُ الْبِدْعِ كِلَابُ النَّارِ، رواه أبو حاتم (الصواعق المحرقة، ٤)

রসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, বিদ'আতীরা জাহান্নামের কুকুর।

বিদআত কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের অন্য সব আমল বিনষ্ট বলে বিবেচ্য হবে। কাজেই যে ব্যক্তির আমল রসূলে করীমের আদর্শ মোতাবেক হবে সে মুক্তি পাবে, যদিও তার আমল কম হয়।অন্য আর একটি হাদীসে বলা ~~বলা~~ হয়েছেঃ

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبَى اللّٰهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَتُوْبَ مِن بِدْعَتِهِ

(رواه ابن عاصم في السنة)

বিদ'আতীর আমল গ্রহণ করাকে আল্লাহ অস্বীকার করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কৃত কর্ম হতে তাওবা না করবে।

বিদআতী ইসলামের শত্রু। তাই ইসলাম তার মৃত্যু কামনা করে। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস তার প্রমান বহন করে।

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فَتَحَ فِى الْاِسْلَامِ فَتْحَ

(الصواعق المحرقة، ص٤)

যখন কোন বিদ'আতী মৃত্যু বরণ করে তখন ইসলামের সফলতার বৃহৎ দরজা খুলে যায়।

বিদআতীর চরম পরিণাম হলো তার তাওবা প্রত্যাখিত হওয়া। হযরত আনাস (রা) রসূলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اِحْتَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، (رواه الطبرانى. الصواعق المحرقة. ص ٣)

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদআতী হতে তাওবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

* বিদ'আতীর প্রতি হুজুর (স.) এর অভিশাপ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةُ بَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ آوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَرْضٌ وَلَا عَدْلٌ، (مشكوة، ص٢٣٨)

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, মদীনা শরীফের মর্যদাপূর্ণ স্থান হলো য়ীর হতে ছুর পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এর মধ্যবর্তী স্থানে কোন বিদ'আত কাজের প্রচলন করবে অথবা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেবে তার প্রতি আল্লাহর, ফেরেস্তাকুলের এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। তার ফরজ ইবাদত এবং নফল ইবাদত কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। (মিশকাতঃ ২৩৮)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, হযরত হোজাইফা (রা.) রসূলে করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَلٰوةً وَلَا صَوْمًا وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا فَرْضًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرُ مِنَ الْعَجِيْنِ (الصواعق المحرقة)

আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতীর নামাজ, রোজা, হজ্ব, ওমরা, যাকাত, জিহাদ, ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই গ্রহণ করবেন না। কাজেই সে ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যে, যেমন আটার মধ্য হতে চুল নির্গত হয়। অর্থাৎ চুলের সাথে আটার একটি কণা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। তদ্রুপ তার মধ্যে প্রকৃত ইসলামের চিহ্ন বাকি থাকবে না। অথবা চুল যেমন সুক্ষভাবে আটা হতে বের হয়ে আসে, তেমন সেও ইসলাম হতে সুক্ষভাবে বের হয়ে যাবে, অথচ সে সামান্যতম অনুধাবনেও সক্ষম হবে না। (ইবনে মাজা, আসসাওয়ায়েকে মুহরেকা)

বিদ'আতী হাউজে কাউসার হতে বিতাড়িতঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَ يَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ (متفق عليه ، مشكوة ، ص ٤٨٧)

নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই আমার নিকট এমন কিছু লোক আসবে (হাউজে কাউসারের নিকটে) যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এরাতো আমার উম্মত। আমাকে তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে এরা (ইসলাম ধর্মে) নতুন নতুন মত ও পথ আবিস্কার করেছে। এ কথা শ্রবনের পর আমি বলব, আমার পরে যারা আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে তারা আমার থেকে দূর হয়ে যাক , দূর হয়ে যাক। (মিশকাতঃ ৪৮৭)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজে হাদীস ইবনে আব্দুল বার বলেন, যারা দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন কাজের (বিদ'আতের) উদ্ভাবন ঘটিয়েছে (বিদ'আতে হাসানা

রাফেজী। বিদ'আতী সীমাহীন জুলুমকারী, অধিকার হরণকারী, প্রকাশ্যে সর্বদা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ইত্যাদি।

মাজালিসুল আবরার কিতাবে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তিকে হাউজে কাউসার হতে বিতাড়িত করা হবে তারা কয়েক প্রকারের হবে। যথা,

ক. কাফির
খ. মুনাফিক
গ. বিদআতী
ঘ. প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহে লিপ্তব্যক্তি
ঙ. গোনাহ্কে হালাল ধারণাকারী
চ. জালিম
ছ. জালিমের সাহায্যকারী।

কাফির আর আকীদাগত মুনাফিকরা সর্বদার জন্য জাহান্নামবাসী হবে। আর বাকি যারা তারা হাউজে কাউসার হতে বিতাড়িত হবার পর আল্লাহ পাকের ইলম অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর পরিত্রাণ পাবে। অথবা এমনও হতে পারে আল্লাহ পাক নিজ ইচ্ছায় শাস্তি ব্যতীত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (মাজালিসুল আবরার)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, আমি কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে তোমাদের অগ্রগামী হবো। যে আমার নিকট যাবে সে তা হতে পান করবে। আর যে একবার তা পান করবে সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না। সেদিন আমার নিকট অনেক দল হাজির হবে, আমি তাদেরকে চিনবো, তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদের ও আমার মাঝে পর্দা পড়ে যাবে। আমি তখন বলবো তারা আমার উম্মত। উত্তর আসবে, তুমি জানো না তোমার পরে তারা পৃথিবীতে কি কি বিদআত কাজ করেছে। তখন আমি বলবো, দূর হও দূর হও।

কিয়ামতের দিন সূর্য অতি নিকট থেকে তাপ বিকিরণ করবে। হাসরের ময়দানে উপস্থিত মানুষ জাহান্নাম স্বচক্ষে অবলোকন করবে। প্রচন্ড গরমে মানুষ তৃষ্ণার্ত হবে। পান করার পানি কোথাও পাওয়া যাবে না। কঠিন কিয়ামতের সেই দিনে সেখানে একটি হাউজ (পানির কূয়া) স্হাপন করা হবে। হাউজের পানি দুধ হতে সাদা, মধূ হতে মিষ্টি এবং বরফ হতেও ঠান্ডা হবে। হুজুর (স.) সেই কাউসারের নিকট সর্ব প্রথম উপবিষ্ট হবেন। তাঁর নিকট গমন কারীকে তিনি এক পেয়ালা পানি পান করাবেন। একবার যে সেই পানি পান করবে সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না। সেদিন বিদ'আতীরাও পানি পান করার জন্য হাউজের দিকে এগিয়ে আসবে। যেহেতু তারা দুনিয়াতে সালাত আদায় করত, রোজ পালন করতো, যাকাত প্রদান করতো তাই রাসূল (স.) তাদের অঙ্গ দেখে চিনতে পারবেন যে, তারা তাঁর উম্মত। আর

বিদ'আতীরাও মহা নবীকে চিনতে পারবে। তারা পানি পানের নিমিত্তে যখনই কাউসারের নিকটবর্তী হবে তখনই ফেরেস্তারা তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবে। হুজুর (স.) ফেরেস্তাদের বলেন, এরাতো আমার উম্মত, অথচ এদেরকে বাধা দেওয়া হচেছ? উত্তরে ফেরেস্তারা জানাবে, আপনার তিরোধানের পর এরা আপনার রেখে আসা দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন প্রথা আবিষ্কার করেছিল, যা আপনি জানতেন না। একথা শ্রবনে মহা নবী (স.) মনে কষ্ট পাবেন এবং তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন হওয়া সত্ত্বেও সেই মুসিবতের দিন ফেরেস্তাদেরকে বলবেন, ওদেরকে আমার নিকট হতে দূর কর।
আল্লাহ পাক সমস্ত উম্মতে হোমাম্মদীকে নবী পাকের শাফায়াত লাভ করার তৌফিক দান করুন।

০০

শয়তানের নিকট অন্য গোনাহ হতে বিদ'আত-ই বেশি প্রিয়

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, শয়তান বলেঃ

> আমি উম্মতে মোহাম্মাদীর পাপকে সুসজ্জিত আকারে প্রকাশ করি। কিন্তু তাদের ইস্তিগফার আমার মেরুদন্ড ভেঙে দেয়। তখন তাদের সামনে এমন পাপের কাজ উপস্থাপন করি যা তারা পাপের কাজ বলে মনে করে না। কাজেই ইস্তেগফার করার প্রয়োজনীয়তাও তারা উপলব্ধি করে না। সে পাপের কাজ হলো বিদ'আত, যাকে তারা দ্বীনের অংগ বলে মনে করে। অথচ তা দ্বিনের কোন অংশই নয়। (ফাযায়েলে জিকির)

অনুরূপ হযরত সুফিয়ান সওরী হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

اَلْبِدْعَةُ اَحَبُّ اِلٰى إِبْلِيْسِ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِىْ لِاَنَّ الْمَعَاصِىْ يُتَابُ عَنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ عَنْهَا. حُكِىَ عَنْ إِبْلِيْسِ أَنَّهُ قَالَ قَصَمْتُ ظُهُوْرَ بَنِىْ آدَمَ بِالْمَعَاصِىْ وَ الْاَوْزَارِ وَ قَصَمُوْا ظَهْرِىْ بِالتَّوْبَةِ

عَنْهَا وَهِيَ الْبِدْعَةُ فِيْ صُوْرَةِ الْعِبَادَةِ. (مجالس الابـرار. ١٣٠ . هداية العباد. ٣٨)

বিদ'আত ইবলিসের নিকট অতি প্রিয় অন্যান্য গোনাহ হতে। কেননা, গোনাহ হতে তাওবা করা হয়, পক্ষান্তরে বিদ'আত হতে তাওবা করা হয় না। কারণ বিদ'আতীরা বিদ'আতকে সাওয়াবের কাজ মনে করে। তাই তাওবা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না।

কথিত আছে, ইবলিস বলে,

> অমি আদম সন্তানের মেরু দন্ড ভেঙে দিয়েছি গোনাহ ও আত্যাচারের দ্বারা। আর বনি আদম আমার মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে ইস্তেগফার তাওবা দ্বারা। অতপর আমি গভীর গবেষণার দ্বারা এমন একটি বিষয় আবিষ্কার করলাম যে, যাকে তারা গোনাহের কাজ মনে করে না। ফলে তা হতে ইস্তেগফার ও তাওবাও করে না। আর সে গোনাহের কাজ হলো ইবাদতের আকারে বিদ'আত কাজ। (মাজালেসুল আবরারঃ ১৩০ পৃ; হেদায়াতুল ইবাদঃ ৩৮ পৃ.)

হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী (রহ.) বলেন,

ضرر صحبت مبتدع فوق ضرر صحبت کافرست و فساد صحبت مبتدع زیاده فاسد صحبت کافرست

বিদ'আতীর বন্ধুত্বের ক্ষতি কাফেরের বন্ধুত্বের ক্ষতি হতে অধিক গুরুতর। আবার বিদ'আতির সঙ্গদানের ক্ষতি কাফেরের সঙ্গদানের ক্ষতি হতে অধিক ভায়বহ। আর সে জন্যই শয়তান আদম সন্তানকে ধ্বংস করার জন্য বিদ'আতের পথকেই অধিক শ্রেয় মনে করে। কারণ আদম সন্তান সেটিকে পাপের কাজ মনে করে না বিধায় তা থেকে তাওবাও করে না।

আসলাফে উম্মতের দৃষ্টিতে বিদ'আত

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহ.) বলেন,

যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতী হতে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করে আল্লাহ্ পাক তাকে উক্ত জ্ঞানের কথা হতে উপকৃত করেন না। যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতির সাথে মুসাফাহা করলো সে ইসলাম ধর্মে আঘাত হানল।

সাইদ আল কুরজী (রহ.) বলেন,

সুলাইমান আত-তাইমী রোগে আক্রান্ত হয়ে অধিক ক্রন্দন করছিলেন। অধিক ক্রন্দনের কারণ জানতে চাওয়া হলে উত্তরে তিনি বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে ক্রন্দন করছি না। ক্রন্দন করছি এই ভয়ে যে, একদা আমি এক বিদ'আতীর পাশ দিয়ে গমন কালে তাকে সালাম প্রদান করেছিলাম। ওই বিদ'আতী তাকদীরকে বিশ্বাস করে না। বরং সৃষ্টি জীবকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। আজ জীবন সনাহ্নে অত্যধিক ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে, আল্লাহ্ পাক এ ব্যাপারে যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, তবে তার উত্তর আমি কি দিব?

হযরত ফোযায়েল বিন ইয়াজ (রহ) বলেনঃ

যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীর পাসে বসে তুমি তার থেকে দুরে থাকবে। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে ভালবাসে আল্লাহ পাক তার সমস্ত নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেন এবং তার অন্তর হতে নূর নির্গত করে দেন। তিনি আরো বলেন, যখন তুমি কোন বিদ'আতীকে রাস্তায় দেখবে, তুমি তখন তোমার জন্য অন্য রাস্তা শ্রেয় মনে করবে। বিদ'আতীর কোন আমল উপরে উঠান হয় না। যে বিদ'আতীকে সাহায্য করলো প্রকারান্তে সে ইসলাম ধর্ম ধ্বংসে সাহায্য করলো। যে বিদ'আতীর নিকট স্বীয় কন্যা বিবাহ দিলো সে পিতৃকুলের বন্ধন ছিন্ন করে দিল। আর যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীর পাশে বসবে তাকে সঠিক জ্ঞান দান করা হবে না। আল্লাহ্ যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, সে বেদ'আতীকে ঘৃণা করে, আমি আশা করি (অর্থাৎ ফোযাইল) আল্লাহ তা'য়ালা তার পাপরাশিকে ক্ষমা করে দিবেন।

মুহাম্মদ বিন আন-নজর আল জারী (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আতীর কথা শ্রবণে মনোযোগী হবে, আল্লাহ তার থেকে হিফাযত উঠিয়ে নিবেন। অর্থাৎ সে আল্লাহর হেফাযতে থাকবে না।

হযরত লাইস ইবনে সায়াদ (রহ.) বলেন, যদি আমি কোন বিদআতীকে পানির উপর চলতেও দেখি, তবুও তাকে আমি গ্রহণ করবো না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) হযরত লাইস (রহ) এর উক্ত বক্তব্য শ্রবণ করে বলেন, ইমাম লাইস কম করে বলেছেন, আমি কোন বিদ'আতীকে বাতাসে উড়তে দেখলেও তাকে গ্রহণ করবো না।

ইমাম জাওযি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, মুহাম্মদ বিন সহল আল বুখারী (রহ) বলেছেন, আমরা ইমাম গাজ্জালী (রহ) এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বিদআতীরা যে ঘৃণ্য ও জঘন্য এ ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। শ্রোতাদের মধ্য হতে একজন আলোচনার বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে হাদীসের কথা শুনানোর জন্য সবিনয় নিবেদন করলো। ইমাম গাজ্জালী উক্ত বক্তব্য শ্রবনে রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, বিদআতীদের সম্পর্কে কথা বলা আমার নিকট ষাট বছরের ইবাদত করা হতেও উত্তম। (তালবীসে ইবলিস)

০০

বিদ'আতের সূচনা

আব্দুর রায্যাক (রহ) যায়িদ ইবনে আলাম (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, সর্ব প্রথম সায়িবার প্রথা কে চালু করেছিল এবং ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্মকে কে পরিবর্তন করেছিল তা আমি জানি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! কে সে? উত্তরে তিনি বললেন, সে ছিল বনু খুজায়া গোত্রের আমর ইবনু লুহাই। আমি দেখেছি যে, তাকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তার শরীর থেকে নির্গত দূর্গন্ধ অন্যান্য জাহান্নামীদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। বাহিরা বিদআতের আবিস্কারক কে তাও আমি জানি। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল ! কে সে? উত্তরে তিনি বললেন, সে ছিল বনু মুদলাজ গোত্রের একটি লোক। তার দুটি উট ছিল। সে উট দুটির কান কেটে দিয়েছিল। প্রথমে সে উক্ত উট দুটির দুধ পান করা নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিল। অল্প দিন পরে সে আবার পান করতে শুরু করে। আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। সেই উট দুটি তাকে কামড়াচ্ছে এবং ক্ষুর দ্বারা আঘাত করছে।

আমর ছিল লুহাই ইবনে কামাআর পুত্র। সে খুযাআর নের্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন ছিল। জুরহুম গোত্রের পরে কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী ছিল তারা। তারাই হযরত ইব্রাহীমের দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। হিজাজ প্রদেশে প্রতিমা পূজার সূচনা করে ছিল তারা। তারা জনগনকে প্রতিমা পূজার দিকে আহবান

করতো। সেই অজ্ঞতার যুগে সর্ব প্রথম হেজাজ প্রদেশে বিদ'আতের প্রচলন ঘটিয়েছিল তারাই।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব হতে বর্ণিত, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন,

আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছি। কিন্তু তোমরা প্রজাপতি ও বার্ষাকালীন সময়ের পোকার ন্যায় আমার দিকে হতে মুহ ফিরিয়ে আগুনের দিকে ছুটে যাচ্ছ। তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেই? জেনে রাখ, হাউজে কাউসারে আমি তোমাদের নেতা হবো। তোমরা পৃথক পৃথক ভাবে ও দলবদ্ধভাবে আমার নিকট আসবে। আমি তোমাদেরকে চিহ্ন ও লক্ষণ দেখে চিনে নিবো সেভাবে, যেভাবে অন্যের উটের মধ্য হতে নিজের উটকে কেহ চিনে নেয়। আমার সামনে হতে বাম দিকে অবস্থিত শাস্তির ফেরেস্তারা তোমাদের কাউকে কাউকে ধরে নিয়ে যেতে চাইবে। আমি তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবো, হে আমার প্রতিপালক! এরাতো আমার উম্মত। উত্তরে আল্লাহ বলবেন, তোমার মৃত্যুর পর তারা ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছিল অথচ তুমি তা জানো না। তোমার পরে তারা পথ ভ্রষ্টতায় প্রত্যাবর্তন করেছিল। আমি সে লোকটিকেও চিনবো যে কাঁধের উপর বকরী উঠিয়ে নিয়ে আসবে। বকরী প্যাঁ প্যাঁ শব্দ করে ডাকতে থাকবে। আর লোকটি আমার নাম ধরে ডাকতে থাকবে। আমি তাকে পরিস্কার জানিয়ে দিব, আল্লাহর সামনে আমি আজ তোমাকে কোন উপকার করতে পারবোনা। আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম। অনুরূপভাবে কেউ উট নিয়ে আসবে। উটও শব্দ করে ডাকতে থাকেব। লোকটি হে মোহাম্মদ! হে মোহাম্মদ ! নাম ধরে ডাকবে। আমি তাকে বলবো তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কিছু বলার নেই। কারণ আমি তোমার নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম।

কেউ কেউ এমন অবস্থায় আসবে তার সাথে ঘোড়া থাকবে। ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনী করবে আর লোকটি আমাকে ডাকবে। তাকেও আমি অনুরূপ উত্তর দিব। অনেকে আবার চামড়ার মোশক হাতে করে নিয়ে আমাকে ডাকতে ডাকতে উপস্থিত হবে। আমি তাকে বলবো, আজ আর আমি তোমাদেরকে কোন প্রকার সাহয্য করতে পারবো না। আমি তো তোমাদেরে কাছে আল্লহর বাণী পৌছিয়ে ছিলাম। (আবু ইয়ালা)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহর এক প্রতিবেশী ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তার সাথে সাক্ষাত করতে যান। তার মুখে মুসলমানের মধ্যে ভেদা-ভেদ, দ্বন্দ-

কলহ ও বিদআতের কথা শ্রবণ করে তার অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, আমি মুহাম্মদ (স.) হতে শুনেছি তিনি বলেছেন, লোকেরা দলে দলে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করবে ঠিকই; কিন্তু অতি সত্বর তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে দ্বীন হতে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে। (মুসনাদে আহমদ)

বিদ'আতের ঢলে সুন্নাত নিমজ্জিত

রসূলে করীম (স.) চৌদ্দশত বছর পূর্বেই দ্বীনের ধারক ও বাহকদেরকে হুশিয়ার করার নিমিত্তে ইরশাদ করেনঃ

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً اِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِدْعَةٍ

যখনই কোন সম্প্রদায় একটি বিদ'আত সৃষ্টি করেছে তখনই একটি সুন্নত লোপ পেয়েছে। সুতরাং একটি সুন্নতের সাথে আমল করা যদিও তা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়, একটি বিদ'আত সৃষ্টি হতে উত্তম যদিও তা বিদ'আতে হাসানা হয়।

(আহমদ, মিশকাত, পৃ. ৩১)

কেননা সুন্নতের অনুসরণে আলো এবং বিদ'আতের অনুসরণে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। আর সুন্নাত রক্ষাকারী আল্লাহর নিকটবর্তী হতে থাকে আর সুন্নত বর্জনকারী পতনের দিকে যেতে থাকে। এভাবে সুন্নত বর্জনের দ্বারা অন্তর কলুষযুক্ত ও কঠোর হতে থাকে।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, যে কাজ রসূলে করীম (স.) হতে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত আছে তার ফযীলাত অনেক বেশি। আর যে কাজ তাঁর থেকে প্রত্যক্ষ প্রমাণিত নয় তার ফযিলাত অনেক কম। যেমন এস্তেঞ্জার আদব-কায়দা রক্ষা করা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হতে উত্তম। কেননা, প্রথমটি রসূলে করীম (স.) এর প্রত্যক্ষ সুন্নত। আর দ্বিতীয়টি বড় ধরণের ছদকায়ে জারিয়া; তবে রসূল (স.) হতে প্রত্যক্ষ প্রমান নেই। হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত হতে বর্ণিতঃ

قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۔ (رواه الدارمى ۔

مشكوة. ص: ٣١)

তিনি বলেন, যখন কোন সম্প্রদায় দীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করেছে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মধ্য হতে সেই পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নিয়েছেন। অতপর তা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট আর ফিরিয়ে দিবেন না।

(দারিমীঃ মিশকাত শরীফঃ পৃ. ৩১)

আল্লামা ত্বীবী বলেনঃ

> বিদ'আতে লিপ্ত হলে সুন্নত দূরিভূত হওয়ার কারণ হলো, বিদ'আত আসার পূর্বে সুন্নত স্বস্হানে সুদৃঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। যখন তাকে বিদূরিত করা হলো, তখন তাকে পুণরায় প্রত্যাবর্তন করান সম্ভব নয়। যেমন দৃঢ়ভাবে অবস্হিত কোন গাছকে স্বমূলে উপড়ানোর পর তাকে যথা স্হানে পূর্বের ন্যায় স্হাপন করা সম্ভব নয়।

হযরত ইয়াহ হিয়া বিন মুয়াজ বলেনঃ

> সমস্ত মতভেদের মূল এমন তিনটি জিনিস যার বিপরীতে আরো তিনটি জিনিস আছে। যে ব্যক্তি প্রথম তিনটির কোন একটি ছেড়ে দিবে, সে দ্বিতীয় তিনটির কোন একটিতে লিপ্ত হবে। তা হলো-
>
> ১. তাওহীদ। এর বিপরীত হলো শির্ক।
>
> ২. সুন্নাত। এর বিপরীত বিদ'আত।
>
> ৩. ইবাদত বা আনুগত্য। এর বিপরীত হলো অবাধ্যতা। (কাশকুল)

সুন্নত পরিহার এবং বিদআত সৃষ্টিকারীর সাথে আল্লাহর রসূল (স.) যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ أُمَّتِهٖ قَبْلِيْ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْ أُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَ أَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَ يَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهٖ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (رواه مسلم مشكوة ٢٩)

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, আমার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এমন কোন নবীকে তাঁর উম্মতের মধ্যে পাঠান নাই, যার উম্মতের মধ্যে তার কোন হাওয়ারীন ব সাহাবীর দল, ছিলেন না। যারা সুন্নতের সাথে আমল করতেন ও তার হুকুমে অনুসরণ করতেন। অতপর এমন লোকেরা তাদের স্হলাভিষিক্ত হলো, যা অন্যদেরকে যা বলত নিজেরা তা আমল করত না। তারা তাই করত যার আদেশ

তাদেরকে করা হয়নি। (আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে) অতএব যে ব্যক্তি নিজের হাত দ্বারা তাদের সাথে জেহাদ করবে সে (পূর্ণ) মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা তাদের সাথে জেহাদ করবে, সেও মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আর যে অন্তর দ্বারা জেহাদ করবে সেও মুমিন বলে বিবেচিত হবে। এরপর এক সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নাই।

(মুসলিমঃ মিশকাত, ২৯)

উক্ত হাদীসে বিদআত পন্থীদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াকে ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ বিদ'আতের অনুপ্রবেশে ইসলামের স্বাতন্ত্র, বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব বিনষ্ট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই হক্কানী ওলামায়ে কেরামদের কর্তব্য রসূল (স.) এর এই হাদীসের উপর আমল করে সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধের মাধ্যমে ইসলামে অনুপ্রবেশকারী সকল বিদআতকে সমূলে বিনাস সাধনের জন্য আত্ম নিয়োগ করা। অন্যথায় বিদআতের আত্ম প্রকাশে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম বজায় থাকলেও প্রকৃত ইসলামের বিদায় ঘটবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেনঃ

قَالَ مَا يَأتِىْ عَلٰى النَّاسِ مِنْ عَامٍ إلَّا اَحْدَثُوا فِيْهِ بِدْعَةً وَ اَمَاتُوا سُنَّةً حَتّٰى تَحْيٰى الْبِدْعُ وَ تَمُوْتُ السُّنَنُ (كتاب الإعتصام، للشاطبى)

মানুষের জীবনে এমন কোন বছর আসে না যে, সে বছর তারা একটি বিদআত আবিষ্কার করে না এবং একটি সুন্নতকে অপাসরণ করায় না। এভাবে বিদ'আতসমূহ জীবিত হয় ও সুন্নতসমূহ অপসারিত হয়।

(কিতাবুল ইতিসাম লিশ-শাত্বিবী)

ওলামায়ে কেরামগণের দ্বীন হতে উদাসীনতা এবং সমাজে সঠিক জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের অভাবে দিন দিন বিদআতের স্থান পাকাপোক্ত হচ্ছে এবং বিদ'আত শিকড় গেড়ে বসেছে। এভাবে চলতে থাকলে একদিন অধঃপতনের শেষসীমায় এসে পৌছাতে হবে। তখন সমস্ত জাতি বিদ'আতকেই দ্বীন বলে মনে করবে। সে সময় বিশুদ্ধ দ্বীনি পন্ডিতগণকে আল্লাহ দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিবেন। হযরত আব্দুল্লহা বিন মাসউদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

لَا يَأتِىْ عَلَيْكُمْ عَامٌ إلَّا هُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَهُ اَمَا إنِّىْ لَسْتُ اَعْنِىْ عَامًا اَخْصَبَ مِنْ عَامٍ وَلَا أمِيْرًا خَيْرًا مِنْ

أَمِيْرٍ وَلٰكِنْ عُلَمَائُكُمْ وَ خِيَارُكُمْ وَ فُقَهَائُكُمْ يَذْهَبُوْنَ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنَ مِنْهُمْ خَلَفًا و تَجِئُ قَوْمٌ يَقِيْسُوْنَ الْاَمْرَ بِرَائِيِهِمْ، (رواه الدارمى)

তোমাদের উপর এমন কোন বছর অতিক্রম করবে না যে, সে বছর পুর্বের বছর অপেক্ষা খারাপ হবে না। (একথার দ্বারা) আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক বছর অপর বছর হতে বেশি সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা ও নব্য নেতা অপর নেতা হতে বেশি ভাল হবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের আলেমগণ, বিশেষজ্ঞ গণ, আইনজ্ঞগণ বিদায় গ্রহণ করবে, আর তোমরা তাদের স্হলাভিষিক্ত প্রাপ্ত হবে না। বরং এমন সব লোকের আগমন ঘটবে যারা নিজেদের যুক্তি ও ধ্যান-ধারনার মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে আত্ম নিয়োগ করতে থাকবে। (দারিমীঃ ১৭৫ পৃ.)

হকপন্থী আলেম-ওলামাদের অভাবে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ও দৌরাত্ম এতো বেশী পরমিাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে যে, তা সুন্নতের স্হান দখল করে নিবে। ফলে মানুষ বিদ'আতকেই সুন্নত হিসেবে আমল করতে থাকবে।

হযরত আলক্বামাহ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيْهَا الْكَبِيْرُ وَيَرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ اِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْئٌ قِيْلَ تُرِكَتِ السُّنَّةُ قَالُوْا وَ مَتٰى ذَاكَ قَالَ اِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَائُكُمْ وَ كَثُرَتْ جُهَلَائُكُمْ وَ كَثُرَتْ قُرَّائُكُمْ وَ قَلَّتْ فُقَهَائُكُمْ وَ كَثُرَتْ اُمَرَائُكُمْ وَ قَلَّتْ اُمَنَائُكُمْ وَ اُلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ(رواه الدارمى ج، ١، ص ٦٤)

সে সময় তোমাদের কি অবস্হা হবে যখন তামাদেরকে এমন ফিৎনা ঘিরে ধরবে যে, যার মধ্যে যুবক বৃদ্ধ হবে ও বালক যুবক হয়ে যাবে। সে সময় কোন পথভ্রষ্ঠ কাজ কে পরিত্যাগ করা হলে বলা হবে সুন্নতকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। (ইবনে মাসউ্দের শিষ্যরা জানতে চাইল) এরূপ মুছিবত কবে আসবে? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্যেকার (সঠিক জ্ঞানের অধিকারী) আলেমগণ বিদায় গ্রহণ করবে, আর মূর্খদের আধিক্য দেখা দিবে। ক্বারী (কুরআন পাঠকারী অথবা বক্তৃতাকারী) অনেক হবে, তবে আমলদার ও বুঝদার আলেম অল্প হবে। নেতাদের

সংখ্যা অধিক হবে, আমানতদার কমে যাবে, আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করা হবে এবং নিছক দুনিয়ার জন্য জ্ঞান (ইলমে দ্বীন) অর্জন করা হবে।
(দারামীঃ ১-৬৪ পৃ)

উল্লিখিত হাদীসের প্রতিফলন বর্তমান সমাজে প্রস্ফুটিত। দুনিয়াদার আলেমগণ দ্বীনকে শুধু দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। বিদ'আত ও কুপ্রথাকে তারা সমাজে দ্বীন হিসেবে ব্যবহার করছে। এহেন পরিস্থিতিতে সুন্নাতের উপর আমল করা এবং শরীয়তের হুকুম অনুসরণ করা কঠিন ও অতিশয় মুশকিল হয়ে পড়ছে। এ দুর্দিনের ভয়াবহতা ব্যক্ত করে রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেনঃ

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمَرِ (مشكوة، ٤٥٩)

মানুষের উপর এমন এক যামানা এসে উপস্থিত হবে, তখন তাদের মধ্যে দ্বীন শরীয়তের উপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণকারীর অবস্থা হবে মুষ্ঠিতে জ্বলন্ত কয়লা ধারণকারীর ন্যায়। (মিশকাতঃ ৪৫৯ পৃ.)

এই কঠিন সময়ে যে ব্যক্তি অপমান, কটাক্ষ ও লজ্জাকে জলাঞ্জলী দিয়ে সুন্নতের অনুসারী হবে এবং বিদ'আত ও কুপ্রথার মুলৎপাটন করার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হবে, তিনিই বীর। ধন্যবাদ পাবার অধিকারী।

হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফ সানী (রহ.) **মাকতুবাত** নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেনঃ

> ছোট একটি সুন্নত অবলম্বন করা দুনিয়া ও অখিরাতের সমস্ত নেয়ামত ভোগ করার চেয়েও বহুগুনে উত্তম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক মাত্র সুন্নত পালনের জন্য আহারের পরে দ্বি-প্রহরে কিঞ্চিত শয়ন, কোটি কোটি রাত্রের সুন্নাত তরককারীর জাগরণ ও নফল নামাজ হতে উত্তম। অনুরূপভাবে ঈদের দিনে রসূলের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে নামাজের পূর্ব সামান্য মিষ্টি অথবা খোর্মা ভক্ষণ শরীয়তের বিপরীত পন্থায় শত বছর রোজা পালন হতেও উত্তম।

মনে রাখতে হবে, অন্তরকে পরিষ্কার করা ও মনের ইচ্ছাকে দমন করা, সুন্নত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালনের উপরই নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী (রহ.) বলেনঃ

> শরীয়তের কার্যাদি পালনে বাধ্য করার উদ্দেশ্য হলো নফ্‌সে আম্মারা (কুপ্রবৃত্তি) কে দূর্বল ও চিন্তায় ফেলা এবং কুরিপুর ইচ্ছাকে বিদূরিত করা। তাই মনগড়া হাজার বছরের সাধনা (রেয়াজত), পরিশ্রম (মোজাহেদা) অপেক্ষা শরীয়ত অনুযায়ী সামান্য আমল অধিক ফলপ্রদ ও উত্তম।

সাধু-সন্নাসীরা সাধনা ও পরিশ্রমে কোন ক্রটি করেনা। কুপ্রবৃত্তিকে পালন ও তাকে শক্তিশালী করা ব্যতীত আর কিছুই হয় না। অথচ শরীয়তের নির্দেশানুসারে ঈদের সকালে একটুখানি মিষ্টি অথবা খুর্মা ভক্ষণ করা কুপ্রবৃত্তিকে বশিভূত করার জন্য , শরীয়ত পরিত্যাগ করে ইচ্ছামত সারা বছর রোজা পালন করার চেয়েও অধিক উত্তম। অনুরূপভাবে ফরজ নামাজ সুন্নাত অনুযায়ী জামাতের সাথে আদায় করা, সারা রাত্রি নফল নামাজ আদায় করে ফজরের ফরজ নামাজ একা একা পড়া হতে উত্তম। সুতরাং ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নেতা-প্রজা সকলের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নবীর আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

০০০

সুন্নত ও বিদ'আতের পার্থক্য

সুন্নাহ এবং বিদ'আতের আলোচনা ভিন্ন ভিন্ন শিরোণামে কিছুটা করা হয়েছে। যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, তাই কে আহ্‌লে সুন্নত ও কে আহ্‌লে বিদ'আত সে বিষয় আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাই এই শিরোনামে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করা হবে, যার দ্বারা কে বিদ'আত পন্থী ও কে শরীয়ত পন্থী তা অবগত হওয়া যাবে।

সুন্নত এবং বিদ'আত সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস। যখন বলা হবে এটি **সুন্নত**, তার অর্থ সেটি বিদ'আত নয়। আর যদি বলা হয় এটি **বিদ'আত**, তবে তার অর্থ হবে এটি সুন্নত নয়; বরং সুন্নতের বিপরীত।

রসূলে করীম (স.) নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পর পূর্বের সকল নবীদের শরীয়ত রহিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন কোন নবীর আবির্ভাবের পথও চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ রসুলে করীম (স.) প্রদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য কোন নতুন পথ ও মত শরীয়তের বিষয় বলে বিবেচিত হবে না। রসূলের প্রেরণের পর এক মাত্র তাঁর আদর্শ ও রেখে যাওয়া শরীয়ত ব্যতীত অন্য সব বাতিল বলে বিবেচিত হবে। তাঁর নির্দেশিত পথেই আল্লাহ কি কাজে সন্তুষ্ট হন

এবং কি কাজে অসন্তুষ্ট হন তা অবগত হওয়া যাবে। তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যে আদেশ-নিষেধ নিয়ে এসেছেন তার নাম দ্বীন ও শরীয়ত। এর পরিপূর্ণতার ঘোষণা আল্লাহ পাক স্বয়ং দিয়েছেন রসূলে করীম (স.) এর তিরোধানের তিনমাস পূর্বে আরাফাতের ময়দানে। সুতরাং এই দ্বীনের মধ্যে কম-বেশী করার অধিকার কারো নেই।

সুন্নত বলা হয় আদর্শ কে। অর্থাৎ রসূল (স.) নবী হিসেবে যা করেছেন, উম্মতকে করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন তার বিপরীত কোন কাজ করার অর্থ সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করা। অর্থাৎ বিদ'আত কাজে লিপ্ত হওয়া। রসূল (স.) এর সুন্নতের অনুসারী হওয়ার সাথে সাথে খোলাফায়ে রাশেদাদের সুন্নতকেও আকঁড়ে ধরার প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মাজীদে সাহাবায়ে কেরাম কে خير امة বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের অনুসারী হওয়ার জন্য আদেশও প্রদান করা হয়েছে। যারা তাঁদের আদর্শ হতে দূরে সরে গেছে তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে। তাই সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ প্রকৃত পক্ষে রসূলের আদর্শের আয়না স্বরূপ। যে কাজে তাঁরা একমত পোষণ করেছেন এবং যে কাজ ঐক্যমতের ভিত্তিতে পরিহার করেছেন তা শরীয়তের দলীল হিসেবে প্রমাণিত। তাই তার অবজ্ঞা করা কারো জন্য বৈধ নয়। আবার যে কাজ সাহাবায়ে কেরামদের কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু অন্যরা তার বিরোধিতা করেনি তাও সঠিক বলে বিবেচিত।

সুন্নতের উল্লিখিত বিশ্লেষণ দ্বারা বিদ'আতের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে তা বলা যায়। অর্থাৎ যে জিনিস রসূলে করীম (স.) , সাহাবায়ে কেরাম (রা.), তাবেয়ীন এবং তাবেতাবেয়ীনের যুগে আমল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এমন জিনিসকে দ্বীনি কাজ বলে মনে করাকে বিদ'আত বলে।

বিদআতের পরিপূর্ণ অর্থ হৃদয়াঙ্গম করার জন্য কয়েকটি বিষয় জানা প্রয়োজন। যথাঃ-

এক. যে সমস্যার ব্যাপারে রসূলে করীম (স.) হতে একাধিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতিটি অবস্থাকেই সুন্নত বলা হয়। তার মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করে অন্যটিকে বিদআত আখ্যা দেয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, যদি তার মধ্যে একটি অবস্থা রহিত হয়ে যায়, তবে অন্য কথা। যেমন নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা শেষে উচ্চস্বরে এবং নিম্ন স্বরে

আমীন বলার এ দুটি পদ্ধতিই সুন্নত। তাই কেউ নিম্ম স্বরে বললে তাকে যেমন বিদ'আত বলা যাবে না, তেমনি উচ্চ স্বরে বললেও বিদ'আত বলা যাবে না।

দুই. যদি কোন একটি কাজ রসূলে করীম (স.) অধিকাংশ সময় করে থাকেন এবং দ্বিতীয় কাজটি এক আধবার করে থাকেন, তবে প্রকৃত সুন্নত যা অধিকাংশ সময় ধরে করেছেন সেটিকেই ধরতে হবে। তবে যে কাজ দু একবার করেছেন তাকে বিদ'আত বলা যাবে না। জায়েজ বলতে হবে।

তিন. পূর্বে আলোচিত তিন যুগের পর যে নতুন জিনিস শরীয়তে প্রবেশ করেছে তা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. শরীয়তে যা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত।

খ. শরীয়তে যা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত নয়। বরং বৈধ কোন কাজ সম্পাদনে পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্য হয়। যেমন কুরআন ও হাদীসে দ্বীনি এলেম শিক্ষা গ্রহণ করা ও শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে অনেক ফযিলাত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কুরআন ও হাদীস যে মাধ্যমে (বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে) শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে তা আলোচিত তিন যুগের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বলে একে বিদ'আত বলা যাবে না।

এমনিভাবে কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফে জিহাদের অনেক ফযিলাত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রগতির উৎকর্ষতার যুগে এসে যে মাধ্যমে যুদ্ধ করা হচ্ছে তা আলোচিত তিন যুগের পরে আবিষ্কৃত হওয়া সত্বেও তাকে বিদ'আত বলা যাবে না। কারণ অস্ত্র এবং জিহাদের পদ্ধতি শরীয়তের উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য জিহাদ করা। অনুরূপভাবে হজ্জের জন্য দেশ ত্যাগ করে ভ্রমণ করা ইবাদতের শামিল। কিন্তু সফরের নব আবিষ্কৃত মাধ্যম ব্যবহার করাকে বিদ'আত বলা যাবে না। কেননা, এ মাধ্যম গুলো ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি মাধ্যম মাত্র। অর্থাৎ যে জিনিস শরীয়তের বিধান পালনের একটি মাধ্যম বলে বিবেচিত তা ব্যবহার করা বিদআত নয়। বরং নব আবিষ্কৃত কোন কাজকে দ্বীনি কাজ মনে করে পালন করা বিদ'আত।

চার. কুরআন ও হাদীসে শরীয়তের অনেক মাসয়ালাকে মূলনীতি হিসেবে বর্ণানা করা হয়েছে। দ্বীনের বিজ্ঞ মুজতাহেদগণকে উক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আগত সমস্ত দ্বীনি সমস্যার

তায়ালা এবং রসূলে করীম (স.) এর অনুসারী হেদায়েত প্রাপ্ত ধর্মীয় পন্ডিতগণ যে সমস্যাসমুহ কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফ হতে বের করেছেন তাকেও বিদ'আত বলা যাবে না। কারণ তা কুরআন এবং হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। এজন্যই কুরআন, সুন্নতে নববী, তায়ামুলে সাহাবী ও তাবেয়ীনের পরে ইমামগণের ইজতিহাদকৃত সমাধানসমূহেকেও দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরা হয়।

পাঁচ. যে কাজ কুরআন, হাদীস, তায়ামুলে সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ধর্মীয় আইনজ্ঞ কর্তৃক ইজতেহাদ ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাকে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির কাশ্‌ফ বা ইলহামের দ্বারা শরীয়তের অংশ বানান জায়েজ নয়। কোন পন্ডিতের কিয়াস দ্বারাও সম্ভব নয়। কেননা এটা শরীয়তের দলীল-প্রমানের চারটি ভিত্তির (কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস) একটিও নয়। এই চারটি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি ও নিয়মকে শরীয়তের দলীল হিসেবে উপস্থাপন করার নামই বিদ'আত। এর দ্বারা কোন সমস্যার শরয়ী সমাধানের প্রমান উপস্থাপন করা যাবে না।

ছয়. ধর্মীয় পন্ডিতগণ বিদ'আতকে আবার দুভাবে ভাগ করেছেন। বিদ'আতে হাসানা (بدعة حسنة) এবং বিদ'আতে ক্বিহাদ (بدعة قبيحة) এ দুটি বিদ'আতকে অনুধাবনের জন্যও মূল নীতি রয়েছে।

মানুষ কোন কাজ তার পরিণাম শুভ না হলে সাধারণত তা করা হতে বিরত থাকে। সুতরাং মানুষ যে কাজ ভাল মনে করে তার কারণ দেখতে হবে। যদি তা রসূলের পর দ্বীনি কোন সমস্যার সমাধানে আবিষ্কৃত হয়ে থাকে তবে তা বৈধ। যেমন দলীল-প্রমাণ প্রণয়ন করা এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে তা দ্বারা পথ প্রদর্শন করা। যেহেতু রসূল (স.) এর যুগে এ সম্প্রদায় বর্তমান ছিল না। তাই তাদের জন্য দলীল-প্রমাণ প্রণয়েরও প্রয়োজন ছিল না।

আর যদি উক্ত কাজ সম্পাদন করার কারণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অস্থায়ী কোন কারণে তাকে রসূল (স.) এর যুগে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআন একত্রিতকরণ। এটি রসূল (স.) এর যুগে প্রয়োজন থাকলেও তা করা হয়নি; কারণ অবতীর্ণের সময় বা তার কিছু পরে রসূল বর্তমান থাকা অবস্থায় কোন আয়াত বা তার বিধান রহিত অথবা তার হুকুম পরিবর্তন করার প্রকট সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু রসুলে করীম (স.) এর তিরোধানের পর কুরআন মাজিদ একত্রিত না করার যে অস্থায়ী কারণ ছিলো তা দূরিভূত হয়ে যায়। আর তাই কুরআনকে একত্রিত করে

বর্তমানের আকার দেয়া বিদ'আত হয়নি। কিন্তু যে কাজ রসূলের যুগে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি করেননি, এমন কাজ বর্তমানে করা দ্বীন ও ধর্মকে পরিবর্তন করার নামান্তর। কেননা সে কাজে যদি মানব মন্ডলীর জন্য কল্যাণ নিহিত থাকত তিনি তা অবশ্যই করতেন এবং উম্মতকেও তা করার জন্য উৎসাহিত করতেন। কাজেই যখন তিনি নিজেও করেননি এবং উম্মতকেও উৎসাহিত করেননি তখন বুঝতে হবে এ কাজে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। বরং তা শরীয়ত বিরোধী বিদ'আতে কুবিহা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঈদের নামাজের আযান দেয়া, যা এক বাদশা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তা ছিল বিদ'আত। কেননা উক্ত কাজ যদি বিদ'আত হওয়া না জায়িয হওয়ার কারণ না হতো, তা হলে বলা হতো এতো আল্লাহ তায়ালার জিক্‌রে শামিল। কেননা, ইবাদতের জন্য মানুষকে আহবান করা ইবাদতে শামিল। এটি জুমার আজানের ন্যায় পুণ্যের কাজ। কিন্তু বিদগ্ধজনেরা আল্লাহ তায়ালার কথা **তার কথা হতে অধিক উত্তম কার কথা হবে যে আল্লাহর প্রতি আহবান করে,** কে দলীল হিসেবে পেশ করে এটিকে বৈধ বলে ফাতওয়া দেননি। বরং বিদ'আত বলে ঘোষণা করেছেন। যেহেতু রসূলে করীম (স.) ঈদের নামাজের জন্য আযান দেন নাই, তাই ঈদের নামাজে আযান না দেয়াই সুন্নত। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, ঈদের নামাজের জন্য আযান দেয়া পুণ্যের কাজ। যদি কেহ একে পূণ্যের কাজ মনে করে এর উত্তরে বলা হবে, যদি দ্বীনের মধ্যে কোন কাজ বাড়ানো বৈধ হতো তা হলে ফজরের নামাজ চার রাকাত এবং জোহরের নামাজ ছয় রাকাত আদায় করলেও পুণ্য হতো। কিন্তু এমন কথা অদ্যবধি কেউ বলতে পারে নি।

বিদ'আতীরা যে উপকারীতা এবং ফযিলাতের কথা বলে নতুন কোন কিছুকে শরীয়তে চালিয়ে দেয়ার মহড়া দেখায়, রসূলে করীমের যুগে সে উপকার এবং ফযিলাত থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেন নি, তা হলে বুঝতে হবে এ কাজ ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত। এখানে কেয়াসের কোন স্থান নেই। এর পরও যদি কোন ব্যক্তি সে কাজ না জায়েয মনে করে, তবে সে ফাসেক হবে, বিদ'আতী নয়। কিন্তু যদি দ্বীনি কাজ মনে করে পালন করে, তা হলে সে ফাসিক এবং বিদ'আতী হিসেবে গণ্য হবে। আর এটি এজন্যে যে, প্রত্যেক বিদ'আতী ফাসিক, কিন্তু প্রত্যেক ফাসিক বিদ'আতী নয়। আর এজন্যই বলা হয় বিদ'আতী ফাসেক হতেও জঘন্য। কারণ বিদ'আতী রসূলে করীম (স.) এর বাণী ভঙ্গকারী, যদিও তার ধারণা মতে এই কাজের মাধ্যমে সে রাসূলের মর্যদা রক্ষা করছে। কিন্তু প্রকারান্তে এটি আল্লাহ ও তার রসূলের সরাসরি বিরোধীতা। কেননা শরীয়তের পক্ষ থেকে তা নির্দিষ্ট করা

হয় নি। বরং শরীয়তের পক্ষ থেকে যা ইবাদত বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বান্দাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট এবং তার দ্বারা দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে এবং তার পক্ষ হতে বান্দার জন্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছে। যেমন তিনি স্বীয় গ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ الخ

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং পূর্ণ করে দিলাম আমার নিয়ামত সমূহকে।

সুতরাং কোন বিষয় পরিপূর্ণ হওয়ার পর তাতে অতিরিক্ত কিছু করাটা ক্ষতি কারক বস্তু। (মাজালেসুল আবরারঃ ১৬৬)

০০০

বিদ'আতে হাসানা ও সায়্যেয়াহ্

বিদ'আতকে যারা দুভাগে ভাগ করেছেন তারা শুধু আভিধানিক অর্থেই শ্রেণীভেদ করেছেন। অর্থাৎ নব আবিস্কৃত বস্তু যেমন ভাল হতে পারে তেমন মন্দও হতে পারে। কিন্তু শরীয়াতে বিদ'আতে হাসানা নেই, সমস্ত বিদ'আতই ক্বিহা।

বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ এবং শরয়ী অর্থ এক নয়, সম্পুর্ণ ভিন্ন। আভিধানিক অর্থে যা প্রশংসনীয় হতে পারে, শরয়ী অর্থে তা প্রশংসনীয় নাও হতে পারে। শরীয়তে বর্ণিত বিদ'আত অর্থই মারদুদ (প্রত্যাখ্যিত) এবং গোমরাহী (পথ ভ্রষ্ঠতা) বলে রসূলে করীম (স.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (সমস্ত বিদ'আতই পথ ভ্রষ্ঠতা)।

এতদসত্বেও দেখা যায় কোন কোন শ্রদ্ধেয় ও বরণীয় হাদীস বিশারদগণ বিদ'আতের শ্রেণী ভাগ করেছেন। তার কোনটিকে ভাল এবং কোনটিকে মন্দ বলে মন্তব্য করেছেন। সাথে সাথে তার কিছু দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছেন। মূলত তাঁরা আভিধানিক বিদ'আত এবং শরয়ী বিদ'আত উভয়কে সামর্থক ভেবেই

এরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, যদি নতুন আবিষ্কৃত বস্তু মাত্রই বিদ'আত হয়, তবে শরীয়তের অনেক এমন ভালো বিষয় ও অতীব প্রয়োজনীয় কাজ বিদ'আত বলে পরিগণিত হবে। অথচ সে সমস্ত বিষয়কে কেউ মন্দ ও নিন্দনীয় বলে বর্জন করে না; বরং গ্রহণ করে। আভিধানিক এবং শরয়ী বিদ'আতকে এক মনে করাতে তাঁরা এরূপ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। কিন্তু মুহাক্কিক হাদীস বিশারদগণ এবং ধর্মীয় আইনবিশারদগণ কিন্তু এরূপ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হন নি। তারা আভিধানিক বিদ'আতকে অভিধানে এবং শরয়ী বিদ'আতকে শরীয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ আভিধানিক বিদ'আতের সংজ্ঞা অভিধান হতে এবং শরীয়তের বিদ'আতকে শরীয়ত হতে গ্রহণ করেছেন।
রসূলে করীম (স.) বিদ'আতের সংজ্ঞায় বলেনঃ

> তোমরা মুহদাস (নতুন আবিষ্কৃত) বস্তু হতে সভয়ে দূরে থাকবে। কেননা, প্রতিটি নতুন বস্তুই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথ ভ্রষ্টতা।

বিশ্ব বরেণ্য আলেম আল্লামা শাতবী, যুগ বরেণ্য মনীষী মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতভী, আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত শেখ আহমদ শের হিন্দী মুজাদ্দিদে আল্‌ফ সানী (রহ.) প্রমুখ ধর্মীয় পন্ডিতগণ আলোচ্য হাদীসের আলোকে বিদ'আতের সংজ্ঞা প্রদান করতঃ বলেন, নতুন মাত্রই বিদ'আত নয়; বরং দ্বীন ইসলামের সংগে যে সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক ও যোগ সুত্র নেই, এমন সব বিষয়কে ধর্মের নামে পূণ্যের লোভে পালন এবং প্রচার করাকে শরীয়তে বর্ণিত বিদ'আত বলা হয়। এতে কোন শ্রেণীভেদ নেই। বরং রসূলে করীম (স.) এর বর্ণনা মতে এর প্রত্যেকটিই প্রত্যাখিত।
হাফেজ ইবনে রজব (রহ.) লিখেছেনঃ

فَكُلُّ مَنْ اَحْدَثَ شَيْئًا وَ نَسَبَهٗ إِلَى الدِّيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ اَصْلٌ مِنَ الدِّيْنِ يَرْجِعُ اِلَيْهِ فَهُوَ ضَلَالَةٌ وَالدِّيْنُ بَرِىٌ مِنْهُ وَ سَوَاءٌ فِى ذٰلِكَ الْاِعْتِقَادُ أَوِ الْاَعْمَالُ أَوِ الْاَقْوَالُ الظَّاهِرَةُ وَ الْبَاطِنَةُ وَاَمَّا مَا وَقَعَ فِى كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اِسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ فَاِنَّمَا ذٰلِكَ فِى الْبِدْعَةِ اللُّغَوِيَّةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ (جامع العلوم والحكم ص. ١٩٣)

যে কেউ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটালো অথচ তার এমন কোন ভিত্তি দ্বীন ইসলামে নেই যার প্রতি (দলীল প্রমানের জন্য) প্রত্যাবর্তন সম্ভব, তা হলো

বিষয়ের হোক অথবা কাজে পরিণত করার বিষয়ের হোক অথবা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথার দ্বারা হোক। আর সলফ তথা উম্মতের বিজ্ঞ পন্ডিতগণ কিছু কিছু বিদআতকে বিদ'আতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আভিধানিক বিদ'আত, শরয়ী বিদ'আত নয়। (জামেউল উলুম ওয়াল হেকমঃ ১৯৩ পৃ.)
বিজ্ঞ ধর্মীয় পন্ডিতগণ বিদআতের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবেঃ

إِنَّ الْبِدْعَةَ عَلٰى قِسْمَيْنِ بِدْعَةٌ لُغَوِيَّةٌ وَ بِدْعَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُحْدَثُ مُطْلَقًا عَادَةً كَانَتْ أَوْ عِبَادَةً وَهِيَ الَّتِيْ يُقَسِّمُوْنَهَا إِلٰى أَقْسَامٍ خَمْسَةٍ . وَاجِبٌ ، مُسْتَحَبٌّ ، حَرَامٌ ، مَكْرُوْهٌ ، مُبَاحٌ) وَالثَّانِيْ وَهُوَ مَا زِيْدَ عَلٰى مَا شُرِعَ مِنْ حَيْثُ الطَّاعَةِ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِّنَ الشَّارِعِ لَا قَوْلًا وَلَا فِعْلًا وَلَا صَرِيْحًا وَ لَا إِشَارَةً وَهِيَ الْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ الْمَحْكُوْمِ عَلَيْهَا بِالضَّلَالَةِ (ترويج الجنان والجنة ، ١٦١)

বিদআত দুই প্রকার। যথা- (১) আভিধানিক বিদআত (২) শরয়ী বিদ'আত।
প্রথম প্রকার আভিধানিক বিদ'আত হলো প্রত্যেক নব আবিস্কৃত কাজ, হোক তা ইবাদতের পর্যায়ে অথবা অভ্যাসের পর্যায়ে। এই আভিধানিক বিদ'আত পাঁচ ভাগে বিভক্ত হতে পারে। (যথা- ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরুহ ও মুবাহ)। আর দ্বিতীয় প্রকার বিদআত হলো, যা কুরুনে সালাসা (তিন যুগ) এর পর ইবাদত হিসেবে দ্বীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত হয়েছে, যার অনুমতি শরীয়তে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশে, কথার দ্বারা অথবা কাজের দ্বারা কোন ভাবেই দেয়া হয়নি। সুতরাং প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী-এর উদ্দেশ্য এই দ্বিতীয় প্রকার বিদআত। শরয়ী বিদআতের কোন শ্রেণী ভেদ নেই। এর প্রত্যেকটি গোমরাহী।

(তারয়ীজুল জেনানা-আলজুন্নাহঃ ১৬১ পৃ.)

আল্লামা আইনী (রহ.)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ উমদাতুল কারী শরহে বুখারীর ৫ম খন্ডে ৩৫৫ পৃ উল্লেখ করেছেন।
এখন জানা প্রয়োজন যে, শরীয়তের অনুমোদিত ও গর্হিত কাজ কি কি? এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেনঃ

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ خَالَفَتْ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ اَثَرًا عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٰذِهِ

بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَبِدْعَةٌ لَمْ تُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَهٰذِهِ قَدْ تَكُوْنُ حَسَنَةً لِقَوْلِ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ (موافقة صريح المعقول الصحيح المنقول)

বিদ'আত দুই প্রকার।

এক. গোমরাহী। সেটি এমন বিদআত যা কুরআন অথবা হাদীস অথবা ইজমা অথবা সাহাবীর আসরের পরিপন্থী।

দুই. উল্লিখিত বিষয়ের (কুরাঅন, হাদীস ইজমা ও আসর) একটিরও পরিপন্থী হবে না। এ প্রকারের বিদআত কখনো কখনো ভাল হয়। যেমন হযরত ওমর (রা.) এর (তারাবীহ নামাজের জামাত) সম্পর্কে বক্তব্য, কতইনা ভাল বিদআত এটি। (মুয়াফিকাত ছরীহুল মাকুল আস্-ছহীহুল মানকুলঃ ২য় খন্ড, ১২৮ পৃ.)

সুতরাং বিদ'আতে হাসানা এমন দ্বীনি কাজকে বলা হয় যার প্রচলনের প্রতিবন্ধকতা রসূলে কারীম (স.) এর তিরোধানের পর বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথবা তা করার প্রয়োজন (দ্বীন সংরক্ষণের জন্য) দেখা দেয়। যদি তার ভিত্তি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় তবে তাকে বিদ'আতে হাসানা বলা হবে। অন্য কথায় তা আভিধানিক বিদ'আত। এটি দোষণীয় নয়। পক্ষান্তরে যে যে বিষয়ের প্রচলনের কারণ ও তাকাজা রসূলে কারীম (স.) এর যুগে উপস্থিত ছিল; কিন্তু তা সত্বেও তিনি উক্ত দ্বীনি কাজ করেননি এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণও করেননি, উক্ত কাজকে বিদ'আতে সায়্যেয়াহ বলা হয়। অন্য কথায় তা শরয়ী বিদ'আত, যা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

বিদ'আতে হাসানা সৃষ্টি করার অধিকার একমাত্র মুজতাহেদগণেরই। যারা মুজতাহেদ নয়, তাদের ইজতেহাদ করে কোন বিষয়কে বিদ'আতে হাসানাহ আখ্যা দেওয়ার অধিকার নেই। ইসলামী আইন বিশারদগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ফাতওয়ায়ে জামেউর রেওয়ায়েতে এবং আল জুন্নাহ নামক গ্রন্থের ৬০ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে বিদ'আতে হাসানা বলে যে সমস্ত বিষয়কে মুজতাহেদীনগণ বিদ'আতে হাসানা বলে আখ্যা প্রদান করেছেন। যদি বর্তমান যুগে কোন ব্যক্তি কোন কাজকে বিদ'আতে হাসানা বলে আখ্যা প্রদান করে, তবে তা সঠিক হবে না। কারণ মুসাফফা কিতাবের মধ্যে উল্লেখ আছে, আমাদেরে যুগে প্রত্যেক বিদ'আত শরয়ী এবং গোমরাহী।

সুন্নত ও বিদ'আত চেনার মূলনীতি

শরী'আত যে কাজকে যে স্থানে স্থির করেছে আমরা যদি শুধু আমাদের জ্ঞানের দ্বারা তার স্থান অন্যত্র অপসারণ করি, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। যেমন দরূদ শরীফ শরীয়ত নামাজের শেষ বৈঠকে তাত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করেছে। কিন্ত যদি কেহ ইজতিহাদ করে বলে দরূদ শরীফ পাঠ উত্তম ইবাদত তাই তাকে প্রথম বৈঠকেও আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে পাঠ করা হোক, তবে তা ভুল হবে। বরং তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। ইসালামী আইনগ্রন্থে আইন বিশারদগণ লিখেছেন যে, যদি কেউ ভুলক্রমে নামাজের প্রথম বৈঠকে اللهم صلى على পর্যন্ত পাঠ করে ফেলে তা হলে তার উপর সোহ্ সেজদা ওয়াজিব হবে না। কারণ বাক্যটি পূর্ণ হয়নি। কিন্তু যদি বাক্য পূর্ণ করে অর্থাৎ اللهم صلى على محمد পর্যন্ত পাঠ করে তবে সোহ্ সেজদা ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে সোহ্ সেজদা না দিলে নামাজ পুণরায় পড়তে হবে।

হযরত সালিম ইবনে উবাই (রা.) এর মজলিসে এক ব্যক্তির হাঁচি এলে সে السلام عليكم (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলল। হযরত তার উত্তরে وعليك و على امك। (তোমার ও তোমার মাতার উপরে) বল্লেন। লোকটি উক্ত বাক্য শ্রবন করে চিন্তিত হলেন। তার চিন্তা দূর করার জন্য তিনি বললেন, আমি তো সে কথাই বলেছি, এ সমস্ত স্থানে রসূল (স.) যা বলতেন। রসূল (স.) এর যামানায় কোন এক ব্যক্তি হাঁচি দেওয়ার পর السلام عليكم। বলে ছিল। রসূল তার উত্তরে বলেছিলেন, وعليك و على امك। এর পর রসূল (স.) বলেছিলেন, যখন কারো হাঁচি আসবে তখন আলহামদুলিল্লাহ বলবে। আর যারা তা শুনবে তারা يرحمك الله। বলবে। এর উত্তরে প্রথম ব্যক্তি يغفر الله لى ولكم বলবে। এর অর্থ হলো السلام عليكم। এর জন্য একটি বিশেষ স্থান শরীআতে নির্ধারিত আছে, সেটি সে স্থানেই সৌন্দর্যমন্ডিত। অর্থাৎ সাক্ষাত ও কুশলাদি বিনিময়ে সালাম প্রদান শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। হাঁচির পরে তার প্রয়োগ ঠিক নয়।

শরী'আত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ও জুমার নামাজ ছাড়া আজান ও একামত দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেনি। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি যুক্তি খাটিয়ে বলে যে, মানুষকে আহবান করার জন্যই যখন পাঁচ ওয়াক্ত এবং জুমার নামাজের জন্য আজান দেয়া হয়, তেমনি ঈদের নামাজ, কুসুফের নামাজ (সূর্য গ্রহণকালে যে নামাজ আদায় করা হয়), ইস্তেসকার নামাজ (বৃষ্টির জন্য নামাজ) এবং জানাজার নামাজে মানুষকে আহবানের জন্য আজান দেওয়া প্রয়োজন। তবে তা হবে নিতান্তই ভুল ও গোমরাহী। কেননা সে যে যুক্তির বদৌলতে তা করতে চাইছে বা করছে তা যদি শরী'আতে গ্রহণযোগ্য হতো, তবে শরী'আত অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ন্যায় ওসব নামাজেও আজান দেয়ার অনুমতি প্রদান করত।

এমনিভাবে কবরের উপর আজান দেয়া বিদ'আত। এক্ষেত্রে যদি কেউ এই যুক্তির অবতারণা করে যে, হাদীস থেকে প্রমাণিত, আজানে শয়তান দূর হয়; তাই মৃত ব্যক্তি হতে শয়তান দূর করার জন্য তার কবরে আজান দেয়া দোষের কি? কিন্তু এটি মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। কেননা, মানুষের পিছনে শয়তানের ধোকা মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বলবত থাকে। মৃত্যুর পরে সে কোন ধোকা দেয় না। তার পরেও যদি তার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতো তবে রসূল (স.), সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে এ কাজটি প্রচলিত হতো। আর এ কারণেই اهل سنة والجماعة এর মতে কবরে আজান দেওয়া বিদ'আত।

আল্লামা শামী (রহ) বলেন, بحر الرائق কিতাবের টীকাতে লিখিত আছে, শাফেয়ী মাজহাবের কিছু আলেম শিশু জন্মের সময় আজান দেয়ার উপর কিয়াস করে মৃত ব্যাক্তিকে দাফনের সময় কবরে আজান দেয়া যাবে বলেছেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.) শরহে ইবাব-এর মধ্যে উক্ত কিয়াসের অসারতা প্রমান করে কবরে আজান দেয়াকে বিদ'আত বলেছেন। (রুদ্দুল মুখতারঃ খন্ড ১, পৃ. ৩৮৫)

এরূপ আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো, নামাজের পর দু পাশের মুসল্লীদের সাথে সালাম ও মুসাফাহা বিনিময়করা। অথচ শরীআত বাহির হতে আগমনকারীর জন্য সালাম ও মোসাফাহার বিধান রেখেছে। একইভাবে ঈদের নামাজের পর মুসাফাহা-মুয়ানাকা করা। সলফে সালেহীনদের যুগে এর প্রচলন ছিলনা।

হযরত শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী মিশকাত শরীফের এক হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, জুমার নামাজ ও ঈদের নামাজের পর মোসাফাহা ও মুয়ানাকা করার যে প্রথা বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে, তা বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করার কারণে বিদ'আত রূপে পরিগণিত হয়েছে।

মোল্লা আলী ক্বরী মিরকাত গ্রন্থে লিখেছেনঃ

وَلِهٰذَا صَرَّحَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِاَنَّهَا مَكْرُوْهَةٌ وَ حِيْنَئِذٍ أَنَّهَا مِنَ الْبِدْعِ الْمَذْمُوْمَةِ (حاشية مشكوة ص ٤٠١)

এই জন্যই আমাদের কোন কোন ধর্মীয় পন্ডিতগণ উক্ত কাজকে স্পষ্ট ভাষায় মাকরুহ বলে ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় এটি নিকৃষ্ট বিদ'আত হবে। (মিশকাতের টীকাঃ পৃ. ৪০১)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী বলেনঃ

وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ غَيْرُهُمْ بِكِرَاهَةِ الْمُصَافَحَةِ الْمُعْتَادَةِ عَقِبَ الصَّلٰوَاتِ مَعَ أَنَّ الْمُصَافَحَةَ سُنَّةٌ وَمَا ذٰلِكَ اِلَّا لِكَوْنِهَا لَمْ تُؤْثَرْ فِي خُصُوْصِ لِهٰذَا الْمَوْضَعِ ، رد المختار، ج ٢، ص ٣٣)

আমাদের (হানাফি মাজহাবের) কোন কোন আলেম এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরামগণও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নামাজের পরে মোসাফাহা করা যা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তা মাকরুহ; মোসাফাহা করা সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও। এটি বিদআত এবং মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো সলফে সালেহীন হতে এ বিশেষ দিন ও স্থানে তার প্রচলন ছিল না। (রদ্দুল মুখতারঃ খন্ড ২, পৃ. ২৩৫)

বিদ'আত পরিচয়ের ২য় মূল নীতিঃ

শরী'আত যে কাজকে মুতলাক অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেনি, তাকে কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা বিদ'আত। যেমন শরীআত কবর যেয়ারতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেনি। সুতরাং কোন বুযুর্গ ব্যক্তির কবরকে যিয়ারতের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা এবং তা জরুরী মনে করা বিদ'আত। (সিরাতে মুস্তাকীম)

বিদ'আত পরিচয়ের তৃতীয় মূলনীতিঃ

শরী'য়ত যে ইবাদতকে যে নিয়মে চালু করেছে তা সে নিয়মে আদায় করা কর্তব্য; তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন কার হারাম এবং নিকৃষ্ট বিদ'আত। অনুরূপভাবে দিবসের নামাজসমূহে কিরাত আস্তে পাঠ করা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। আর রাতের নামাজ সমূহে এবং ঈদ ও জুমার নামাজের কিরাত জোরে পাঠ করার বিধান শরীআত নির্ধারণ করেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি মনোমুগ্ধকর

সুর শ্রবনের জন্য দিনের নামাজেও জোরে কিরাত পাঠ করে তা হলে তা হবে নাজায়েয ও বিদ'আত।

এমনিভাবে নামাজ শেষে হাদীসে বিভিন্ন ধরণের দুআ পাঠ করার কথা এসেছে। তবে নবী করীম স. সাহাবায়ে কেরামগণ সে দুয়া উচ্চ স্বরে পাঠ করেননি। তাই নামাজ শেষে উচ্চ স্বরে কোন দুয়া পাঠ করা বা নামাজ শেষে একত্রে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করার কোন নিয়ম রসূলে করীম (স.) সাহাবায়ে কেরাম এবং সলফে সালেহীনদের যুগে ছিন না। কাজেই এসমস্ত কাজও বিদ' আত। (সিরাতে মুস্তাকীম)

বিদ'আতের চতুর্থ মূল নীতি

শরী'য়াত কর্তৃক যে কাজ একা একা আদায় করার মূলনীতি প্রদান করা হয়েছে তা জামাতের সাথে আদায় করা বিদ'আত। যেমন নফল নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা । আল্লামা শামী বলেছেনঃ

وَلِذَا مَنَعُوْا عَنِ الْاِجْتِمَاعِ لِصَلٰوةِ الرَّغَائِبِ الَّتِىْ اَحْدَثَهَا بَعْضُ الْمُتَعَبِّدِيْنَ لِأَنَّهَا لَمْ تُؤْثَرْ عَلٰى هٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فِىْ تِلْكَ اللَّيَالِىْ الْمَخْصُوْصَةِ وَاِنْ كَانَتْ الصَّلٰوةُ خَيْرَ مَوْضُوْعٍ. (رد المختار، ج ٢، ص ٢٣٥)

এই জন্য আইন বিশারদগণ রাগায়েব (এক ধরণের বিশেষ নফল নামাজ) এর জন্য জামাত করতে নিষেধ করেছেন। এটিকে কিছু আবেদ আবিষ্কার করেছেন। কেননা, ঐ বিশেষ রাতসমূহের মধ্যে এ বিশেষ পদ্ধতিতে নামাজ পড়ার নিয়ম শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত নয়, যদিও নামাজ ভালো কাজ।

(শামীঃ খন্ড ২, পৃ. ২৩৫)

অনুরূপভাবে শবে বারাত, শবে ক্বদ্‌র, শবে মেরাজ ইত্যাদিতে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত হওয়াও বিদ'আত। (সিরাতে মুস্তাকীম)

বিদ'আতীদের দলীল খন্ডন

যারা বিদআতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ওকালতি করতে গিয়ে বিদআতকে বিদআতে হাসানা এবং সায়্যিয়াহ-তে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা সব বিদআত যে মন্দ নয় বরং অনেক বিদআত ভাল ও কল্যাণকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমন বিদ'আতকে তাঁরা বলে থাকেন বিদআতে হাসানাহ। এর স্বপক্ষে তারা দু তিনটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। যেমন,

১) لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِى عَلَى الضَّلَالَة

আমার উম্মত সমবেতভাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

২) مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

ইসলামের মধ্যে যে কেউ একটি সুন্নত উপস্থাপন করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং যারা সে সুন্নতের উপর আমল করবে তাদের পুণ্যেরও ভাগী হবে।

৩) فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

মুসলিম যা ভাল মনে করবে, আল্লাহর নিকট তা সুন্দর বলে গৃহীত হবে।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত ৩টি হাদীসের কোনটিই বিদ'আতকে হাসানা বলে ঘোষণা করে না। আর যে বিষয়টিকে তাঁরা বিদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করে তার উপর বিশ্ব মুসলিমের সর্ব সম্মত হওয়া দূরের কথা, কোন ক্ষেত্রেই তা সর্ব সম্মত নয়; বরং তা বিতর্কিত ও নিন্দনীয়।

যদি ৩য় হাদীসের আলোকে (মুসলমানেরা যা ভাল বলবে-----) বলা হয়, মুসলমানেরা অনেক বিদ'আতে হাসানাকে ভাল বলেছেন সেগুলো? তার উত্তরে বলা হবে, তা হলে কোন মন্দই আর মন্দ থাকবে না। কেননা অনেক মন্দকেই মুসলমানেরা ভাল বলে। আর প্রথম হাদীসের অর্থ (সকল উম্মত-------) বলতে উম্মতের সমস্ত উম্মত অথবা উম্মতের মধ্যকার বিদগ্ধজন তথা ইমাম ও মুজতাহিদগন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা কোন ভূল বা মন্দ বিষয়ে একমত হবেন না। এমতাবস্থায় হাদীসটিতে বিদআতে হাসানার কোন অবকাশ নেই। আর তথাকথিত বিদ'আতে হাসানা উভয় ক্ষেত্রেই বিতর্কিত। অনুরূপভাবে ২য় হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসলামী আদর্শ প্রচলনে যদি কেউ সূত্রপাত করে, তবে আদর্শের বাস্তাবায়নে ও রূপায়নের পথ প্রদর্শক হেতু তিনি অনুকরণ ও অনুসরণকারীর পূণ্যের ভাগী হবেন। এই হাদীসটি উম্মতকে ইসলামী আদর্শ রূপায়নের জন্য উৎসাহ প্রদান

করেছে। এর উদাহণরণ হলো এই যে, কোন ব্যক্তি প্রথমে দান-ছদকা করলো, তার দেখাদেখি অন্যরা দান করলো, তার দেখাদেখি অন্যরা ----। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির পূণ্য অন্যদের থেকে অনেক বেশী হবে।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তা দ্বীনের নামে করতে হবে। ইসলামের সাথে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সম্পর্ক ও যোগসূত্র নেই এমন বিষয়কে ইসলামের নামে চালু করতে হবে।

তৃতীয় হাদীসটিও বিদআতে হাসানা প্রমানে একদম অচল। প্রথমত বাস্তবে এটি হাদীসই নয়। অর্থাৎ রসূলে করীম (স.) এর মুখের বাণী নয়। প্রকৃত পক্ষে এটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর উক্তি। তার পরও তা বিদআতে হাসানাকে সমর্থন করেনি। উক্ত বাণীর প্রথম হতে একটি অব্যয় (ف) বাদ পড়েছে। ঐ অব্যয় অর্থের ক্ষেতে বিরাট গুরুত্ব বহন করে। ওই অব্যয়টি থাকলে বাণীটির অর্থ হয়, -- অতএব মুসলমানেরা যাকে সুন্দর মনে করবে তাই সুন্দর বলে বিবেচিত হবে। এর সঙ্গে হতোপূর্বে আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ তার বান্দাদের অন্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের মধ্য হতে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে নবুওতের জন্য মনোনীত করেন। অতপর আল্লাহ তা 'আলা পূণরায় বান্দাদের অন্তর লক্ষ্য করতঃ হুজুর (স.) এর সঙ্গী-সহচর এবং উজির-নাজির মনোনীত করেন। অতএব মুসলমানগণ যা সুন্দর বলবে তাই সুন্দর হবে।" আলোচ্য বাক্যে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেছে যে, মুসলমান বলতে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদেরকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ তারা যা ভাল মনে করবে তাই ভাল বলে বিবেচিত হবে। এর দ্বারা সলিমউদ্দীন, কলিমউদ্দীন উদ্দেশ্য নয়। তাই যদি হতো তবে সব বস্তুই ভাল অথবা মন্দ হতো। কেননা আমার চোখে যা ভাল অন্যের চোখে তা মন্দ বলে বিবেচিত। আবার অন্যের চোখে যা ভাল আমার চোখে তা মন্দ বলে বিবেচিত। মূল কথা ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য এমন লোক হওয়া বঞ্ছনীয় যারা গ্রহণীয় ও বরণীয়। তাছাড়া সাধারণ মুসলমান যদি হাদীসের উদ্দেশ্য হতো তবে রসূল (স.) এর অন্য হাদীস (অতীতের উম্মত ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসারী হবে তারা সঠিক পথের হবে) অর্থ কি ধরা হবে?

বিদআত প্রবক্তাদের মনগড়া বক্তব্য মেনে নিলে এই হাদীসটির কোন অর্থই হয় না। কেননা যে যা করবে তাই যদি ভাল হয় কোন উম্মতই গোমরাহের মধ্যে নিপতিত হবে না। তা হলে জাহান্নামে কোন দল বা কে যাবে?

বলা বহুল্য, বিদ‘আতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এর রয়েছে সুদুর প্রসারী প্রভাব। কাজেই বিদআত যতই সুন্দর ও উত্তম বলে বিবেচিত হোক না কেন, তা বর্জন ও প্রতিহত করা বাঞ্ছনীয়। বিদআতের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের মধ্যে ৩৮ প্রচলন এবং সংযোজনের অর্থ এই যে, ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন নয়। এক্ষেত্রে اليوم اكملت لكم دينكم এবং يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليه ربك আয়াত মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। (নাউজু বিল্লাহ)।

যেহেতু দ্বীনের বিধান পালনের যোগসুত্র আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই নিজেদের মনগড়া কিছুকে দ্বীনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার অর্থ আল্লাহ এবং তার রসূলের উপর মিথ্যা অপবাদেরই নামান্তর। তাছাড়া এরূপ বিদআতের কারণে দ্বীনের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কোনটি সঠিক এবং কোনটি সঠিক নয় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে চলে যায়।

বিদ‘আতের প্রলচন ও প্রসার মূলত দ্বীন ধ্বংসের পায়তারা। তাইতো হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বিদআতীকে শ্রদ্ধা করলো সে দ্বীন ধ্বংসের কাজে সহায়তা করল। অন্যত্র বলা হয়েছে, একটি বিদআতের প্রচলন একটি সুন্নতের সমাধির সমতুল্য। এ জন্যই বলা হয়েছে, স্বল্প পূণ্যের সুন্নত আদায় বিদআতের নামে সাধনা অপেক্ষা উত্তম। (আল মানান, হাদীস)

বিদ'আত আবিষ্কার দ্বীন ধ্বংসের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র

আল্লাহ তায়ালা ইসলমী ঐক্য সূদৃঢ় করার নিমিত্তে ইরশাদ করেন ঃ

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا (ال عمران)

অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সূদৃঢ় হস্তে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহের কারনে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। (সুরায়ে আল ইমরান)

আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণা যে, তিনি আমাদেরকে এক নবীর উম্মত হিসাবে প্রেরণ করে একটিই কিতাব দান করেছেন যাতে আমরা সবাই তার উপর আমল করতে পারি। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আমরা ঐক্যকে বিনষ্ট না করি। কেননা মতভেদের অনিবার্য ফলাফল হলো দ্বীনের ধ্বংস।
তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআনে কারীম কে আল্লাহর রজ্জু মনে কর। যে ভাবে কোন ব্যক্তি গভীর গর্তে পতিত হলে অন্যরা তাকে মজবুত রজ্জুর মাধ্যমে গর্ত হতে বের করে। অনুরূপ তোমরাও ভয়াবহ গর্তের মধ্যে নিপতিত ছিলে, আল্লাহ্ তায়ালা আসমান হতে রজ্জু ফেলে তোমাদের কে গর্ত হতে বের করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআনে কারীম তোমাদের হস্তে প্রদান করেছেন। সুতরাং গর্ত হতে বের হওয়া ব্যক্তির ন্যায় তা মজবুত করে আঁকড়ে ধরো। যে ব্যক্তি রজ্জুকে ধরবেনা সে গর্ত হতে বের হতে পারবেনা। এই জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কুরআনের আদেশ-নিষেধের উপর আমল করা অপরিহার্য। যদি আমল না করা হয় তবে দূর্গন্ধময় গর্তের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। আর যদি আমল উৎসাহ ও উদ্দিপনার সাথে না হয় তাহলে ও রজ্জু ছুটে পুণরায় গর্তে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাই সকলকে এক সাথে আল্লহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে হবে ও নতুন নতুন কর্মের আবিস্কার হতে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় মতভেদ সৃষ্টি হবে এবং

সত্যের রাস্তা হতে বিচ্যুতি ঘটবে। বিদ'আত ও রুসুমাত আবিস্কারের ফলে নতুন নতুন দল হবে। বিভক্ত হয়ে পড়বে ইসলামী উম্মাহ। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তাদের শক্তি। এহেন ধ্বংস থেকে বিরত থাকার নিমিত্তে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‎* يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ط فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (ال عمران)

তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ আসার পরও বিরোধীতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এখন সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার সুস্পষ্ট আদেশ পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের নিকট এসেছিল যে, তোমরা দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃস্টি করে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়োনা। কিন্তু মতভেদের কারণে তাদের মধ্যে অনেক দলের সৃষ্টি হয়েছিল। ইহুদী এবং খৃষ্টান প্রত্যেকে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে আল্লাহ তা'য়ালার কঠিন আযাবে নিপতিত হয়েছিল। তোমরা তাদের মতো হয়ো না। পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করে কলহপূর্ণ জীবন জাপন করো না।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, যে কাজ হতে বিরত থাকার জন্য শরীয়তের পক্ষহতে কঠোর আদেশ এসেছে, মুসলমান সে কাজকে অতি উৎসাহের সাথে আঁকড়ে ধরেছে। কেউ মোতাযেলা, কেউ খারেজী, কেউ রাফেজী কেউ শীয়া, আবার কেউ মারজিয়্যা, কেউ ভান্ডারিয়া, কেউ দেওয়ানবাগী, কেউ আটরশি, আবার কেউ চরমুনাই, কেউ মুজাদ্দেদীয়া, কেউ নকশবন্দিয়া, কেউ চিশতিয়া, কেউ কাদেরীয়া, কেউ বেরেলবী, কেউ শর্ষীনা ইত্যাদি দলে বিভক্ত হয়ে ইসলামের ঐতিহ্য কে ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ আদেশছিল সম্মিলিতভাবে কুরআন এবং হাদীসের উপর আমল করে রসুল (স.) এর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের ন্যায় বিভক্ত না হওয়া এবং নতুন নতুন মত আবিস্কার করে উম্মতকে ছিন্ন ভিন্ন না করা।

কিয়ামতের ময়দানে কিছু চেহারা বিজয়ের আনন্দে ঝল মল করবে। কিছু চেহার কাল রং ধারণ করবে। কালো রং ধারণকারী চেহারা সমুহকে লক্ষ্যা করে বলা হবে, তোমরা ইসলাম গ্রহন করেছিলে এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলার শপথ করেছিলে অতঃপর তোমরা দ্বিনের মধ্যে নতুন নতুন কাজ এবং বাপ- দাদার রসমের প্রচলন ঘটিয়েছিলে , যার কারণে কিতাবুল্লার আমল ছুটে গেছে। যখন এই বিদ'আত আস্তে আস্তে ক্রমশঃ উন্নতি হতে হতে বাপ-দাদার মায্হাবে পরিণত হয়ে গেল তখন তোমদের অন্তরে এ বিদআতের এমন গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হলো যে, তার জন্য জীবণ দেয়া সম্ভব হলেও কিন্তু পরিহার করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কুরআন যে বিদ'আতকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ প্রদান করেছিল তা অন্তরের দ্বারা অস্বীকার করা প্রমাণ হয়ে গেল। এখন তোমরা কুরআনী হুকুমকে অস্বীকার করার স্বাদ আস্বাদন কর। আয়াতের উল্লেখিত ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিদ্আত আবিস্কার করে পারত পক্ষে সে কুরআনকে অস্বিকার করে এবং কিয়ামতের দিন তার চেহারা কালো হবে এবং তাকে বেইজ্জতী করা হবে।

(ত্বাকয়ীয়াতুল ঈমান: ৮৫ পৃ.)

ধর্মে মতভেদকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী

দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টিকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী প্রদর্শন করে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْئٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ط ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (سورة أنعام)

নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তায়ালার নিকট সপর্দ করা হল। অতপর তিনি বলে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে।

(সুরায়ে আনয়াম-১৯৫)

অর্থাৎ যারা দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে নতুন নতুন দলের জন্ম দেয়, এবং তাদেরকে হেদায়েতের বাণী শ্রবণ করানোর পর ও সঠিক পথ অবলম্বন করে না এবং সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলে না, হে নবী আপনি তাদের সাথে কোন সম্পর্ক

রাখবেন না। তারা আপনার রাস্তায় নেই, তাদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তা'য়ালা যখন তাদেরকে ভয়াবহ আযাবে নিক্ষেপ করবেন, তখন তাদের চক্ষু খুলবে এবং বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, তাদের কাজ কর্ম-সব কিছু ছিল ভ্রান্ত।

বুঝাগেল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুল (স.) এর হুকুম মুতাবেক আমল না করে এবং দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন বস্তুর সংযোজন ঘটায় এবং তাদেরকে হেদায়েতের বাণী শুনাবার পরও উক্ত কর্ম হতে ফিরে না আসে; আল্লাহ তায়ালা তাঁর হিদায়েত ও রহমত সে ব্যক্তি হতে ছিনিয়ে নেন। ফলে সে আজীবণ পথভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবে থাকে।

কিয়ামতের দিন যে কাজ আযাবে নিপতিত করবে, সে কাজ শরীয়ত অথবা যুক্তির দিক থেকে প্রকাশ্য অপছন্দনীয় ও সবলের নিকট বর্জনীয়। কিন্তু যে কাজ মানুষ জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা আবিস্কার করে অথবা অন্যের দেখা দেখি করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যেহেতু কুরআন ও হাদীসে তার স্পষ্ট খারাবীর বর্ণনা পাওয়া যায় না তাই কর্তা উক্ত কাজকে ভাল মনে করে উৎসাহের সাথে করতে থাকে। এমন ভাবে অনেক মানুষ নতুন নতুন কাজকে স্বীয় যুক্তিতে আবিস্কার করে, অতঃপর তা গ্রহন করে আমল করতে থাকে। তাই প্রত্যেকটি দলের স্বতন্ত্র আবিস্কৃত বিদ'আত পৃথক হওয়ার কারণে তারা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যকটি দল অন্য দল হতে স্বতন্ত্র হয়ে যায়।। তখন আর ঐক্য বাকী থাকে না। যেমন এক দল হযরত আলী (রাঃ) কে সমস্ত সাহাবী হতে উত্তম বলে বিশ্বাস করে। তাদের নাম তাফযীলিয়া। অন্য আর এক দল তাদের থেকে আরো অগ্রসর হয়ে হযরত আলী (রাঃ) কে সমস্ত সাহাবী হতে উত্তম মনে করার সাথে সাথে অন্য সাহাবীদের কুৎসা বর্ণনা করে। তাদের নাম শীয়া এবং محب اهل بيت । আর এক দল তাদের বিপরীত। অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) এর দোষ ত্রুটি বর্ণনা করে থাকে। তাদের নাম খারেজী। অন্য এক দল হযরত আলী (রাঃ) এর সন্তানদের সাথে শত্রুতাপোষণ করে। তাদের নাম নাসেবী। একদল শাফায়াত এবং দীদারে ইলাহী কে অস্বীকার করে এবং কবিরা গোনাহের দ্বারা কাফের হয়ে যায় এই আকীদা পোষণ করে। তারা হলো মোতাঝেলী। অন্য এক দল আমরে বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দিয়ে গোসানীসি অবলম্বন করে। ওরস, মোরাকাবা, গান-বাজনা. নাচ-গান, ইত্যাদিতে লিপ্ত। তাদের নাম মাশায়ীখ এবং পীর। এর মধ্যে কেউ চিশ্‌তিয়া, কেউ কাদেরীয়া, কেউ নকসা বন্দিয়া। আবার কেউ সরওয়ারদীয়া বলে দাবী করে; প্রকৃতপক্ষে এরা ভন্ড। এ ছাড়াও আরো হাজার হাজার দলের প্রকাশ ঘটেছে। মজার ব্যাপার হল, প্রত্যেক দল স্বীয়

আবিষ্কৃত মতকে হক ও সঠিক বলে ধারনা করছে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, এ তো মুসলমানের কাজ নয়। এহেন গর্হিত কাজ হতে ফিতে আসার জন্য আল্লাহ তায়ালা কঠোর ভাবে আদেশ করেছেন।

তাহলে বুঝাগেল যে, মানুষ নিজের মত ও পথ কে সঠিক ধারণা করলে চলবে না। বরং হক ও সত্যের অন্বেষণের ধারাবাহিকতা চালু রাখতে হবে। তাতে যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হয়, তবে আল্লাহর শুকরীয়া আদায় করে সে পথে অবিচল থাকতে হবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করতে হবে।

গোমরাহীর মূল হলো স্বীয় মনগড়া বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকা ও হকের সন্ধান না করা। আর নিজের মতকে কুরআন ও হাদীসের সাথে যাচাই না করা। বর্তমানে অনেক ব্যক্তি এমন আছে, যারা কুরআন ও হাদীসকে নিজেদের আক্বিদার সাথে যাচাই করে, যদি নিজেদের আক্বিদার পরিপন্থী হয়, তবে মনগড়া তাফসীর করে স্বীয় আক্বিদার সাথে মিলিয়ে নেয়ার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। প্রিয় মুসলিম ভ্রাতাগণ! এই ধরণের নিকৃষ্ট কাজ ছিল ইয়াহুদীদের। তাদের উপর আল্লাহর ভয়াবহ আযাব অবতীর্ন হয়েছে। এই কারণে মুসলমানদের জন্য আবশ্যক, আল্লাহকে ভয় করে ইয়াহুদীদের তরীকা বর্জন করা এবং কুরআন ও হাদীসের নির্দেশকে নিজের মত ও পথ হিসাবে নির্বাচন করা।

বিদ'আতীদের তাওহীদের দাবী প্রত্যাখ্যাত

ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসীদের মনগড়া খোদা-রসুল প্রীতির রং ঢং ও দেয়াল লেখনী দেখলে মনে হয় ,তারাই সত্যিকার তৌহীদ ও রিসালাতের দাবীদার। অথচ তাদের কাজ কর্ম কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য বিপরীত।

আল্লাহ তায়ালা তার প্রকৃত মুহাব্বাত কারীকে সঠিক পথ নির্ণয়ে ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌرَّحِيمٌ (سورة ال عمران)

(হেরসুল!) আপনি বলুন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তা হলে আমাকে অনুসরন কর, আল্লাহও তোমাদেরকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় পাপ মার্জনা করে দিবেন।

অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় আল্লাহ তা'য়ালার মুহাব্বত ও বন্দেগীর দাবীদার এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী স্বীয় ধর্ম পালনের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির দাবী করে। অতঃপর ধর্ম পালনে কোন ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে আল্লাহর নিকটই তা ক্ষমার আশা করে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা রসুলে করীম (স.) কে আদেশ করেছেন, আপনি দুনিয়াবাসীর নিকট ঘোষণা করুন, তোমাদের আল্লাহপ্রীতির দাবী আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা আমার অনুসরণ ব্যতীত । তোমরা যদি সত্যিকার আল্লাহকে মুহব্বত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, তাহলে আমার কথা মতো চলো। তিনি তোমাদের গোনাহ মাপ করে দেবেন। কেননা তিনি গাফুর এবং রহীম । সুতরং যদি কোন ব্যক্তি রসুল (স.) এর অনুসরণ না করে এবং নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন প্রথা আবিস্কার করে এবং অল্লাহর মুহব্বতের দাবীদার হয় সে মিথ্যাবাদী । আল্লাহ তায়ালা তার উপর অসন্তুষ্ট এবং তারপ্রতি নবী করীম (স.) এর অভিশাপ। কেননা যদিও সে প্রকাশ্যে মুহব্বতের দাবী করছে, প্রকৃতপক্ষে সে শরীয়তে নতুন প্রথা আবিস্কার করে নবুওয়াতের দাবী করছে। এ যেন ভিতরে রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও বাহিরে চাটুকারিতা। প্রকৃত মহব্বতের দাবী হলো স্বীয় ইচ্ছা ও অভিলাষকে প্রিয়ার ইচ্ছায় কুরবান করে দেয়া।

কাজেই বুঝাগেল যারা সুন্নতের অনুসরন করেনা শুধু মুখে রসুলের মহব্বতের দাবী করে, তারা মিথ্যা বাদী এবং যে সুন্নাতের অনুসরণ করে সত্যিকার সেই আল্লাহ ও তার রসুলের প্রিয়।

* * *

সুন্নাতের পরিপন্থী পীরের অজিফা বর্জনীয়

রসুলে করীম (স.) এর অনুসরণেই সমস্ত বুযুর্গী সীমাবদ্ধ, যদিও বাহ্যতঃ তা ইবাদত বলে মনে না হয়। বিদ'আত ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণে বুযুর্গী নেই যদিও তা প্রকাশ্যভাবে বড় ইবাদত মনে হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত:

قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ رَوَاحَةَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَالِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا اَصْحَابُهُ وَقَالَ اَتَخَلَّفُ وَ اُصَلِّيْ مَعْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلَّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَاٰهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَغْدُوْ مَعْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ اَرَدْتُ اَنْ اُصَلِّيْ مَعَكَ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَقَالَ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ

(رواه الترمذي—مشكوة صـ ٣٤٠)

তিনি বলেন: রাসুলে করীম (স.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাকে একটি সেনাদলে (অধিনায়ক নিযুক্ত করে) পাঠালেন, ঘটনাক্রমে সেদিন ছিল শুক্রবার। তারঁ সঙ্গিরা তো ভোরেই রওয়ানা করে চলে গেল কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (মনে মনে) বললেন, আমি তাদের পশ্চাতে থেকে যাব এবং রাসুলে করীম (স.) এর সাথে জুমুআর নামাজ আদায় করে পরে যেয়ে সঙ্গিদের সাথে মিলিত হবো। অতঃপর তিনি যখন রাসুলে করীম (স.)এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করলেন তখন তিনি আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভোরে তোমার সঙ্গীদের সাথে যাওয়া থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছে? উত্তরে তিনি বললেন আমি এই আশায় রয়ে গেছি যে, আপনার সাথে জুমার নামাজ আদায় করে পরে সঙ্গিদের সাথে মিলিত হবো। রাসুলে করীম (স.) ইরশাদ করলেন যে, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যায় করো তবুও তুমি সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার ফযীলত হাসিল করতে পারবে না। (তিরমিজী-মিশকাত ৩৪০)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইবাদাত বাহ্যিক ভাবে যত বড়ই হোক না কেন, যদি তা নবী করমি (স.) এর অনুকরণের খেলাপ হয় তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। হযরত আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন,

> যে ব্যক্তি রাসুলে করীম (স.) এর সুন্নতের খেলাফ কোন আমল করে তা বাতিল ও অগ্রহণ যোগ্য।

হযরত মোজাদ্দিদ (র.) মাক্তুবাতের এক স্থানে লিখেছেন,

> এটা (তার সময়) এমন সময় যে, হযরত রসুলে করীম (স.) এর সময় হতে একহাজার বৎসর পরের জামানা। এখন কিয়ামতের আলামত দেখা দিয়েছে এবং এ জামানা তাঁর জামানা হতে দূরে হওয়ার কারনে সুন্নাত বিলুপ্ত হতে চলেছে।

মিথ্যা প্রসারের দরুন বিদ'আত প্রসারিত হয়ে সুন্নাতের স্থান দখল করছে। শাহবাজের ন্যায় বীর পুরুষের প্রয়োজন বিদ'আতের মূলৎপাটন করার জন্য। কারণ বিদআত প্রচলনের অর্থ হলো ধর্মকে ধ্বংস করা। আর বিদ'আতীকে সম্মান করা মানে ইসলামকে ধুলিস্যাৎ করা। আপনি শুনে থাকবেন যে, রসুলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন , যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করলো সে ইসলামকে ধ্বংসের জন্য সাহায্য করলো। সবসময় স্বীয় শক্তি ও ইচ্ছা সুন্নতসমুহ হতে একটি সুন্নাত হলেও জারি করা এবং বিদ'আত হতে একটি বিদ'আত হলেও দুরীভুত করার মধ্যে সময় ব্যায় করা। ইসলামের এই দুর্দিনে সুন্নাতের প্রচলন ও বিদআতের মূলোৎপাটনের মাধ্যমেই ইসলামের রীতি-নীতিগুলি কয়েম রাখা যেতে পারে ।

অতীত কালের মনিষীবৃন্দ বোধ হয় বিদ'আতের মধ্যে সামান্য কিছু উপকারিতা দেখতে পেয়ে বিদআতকে হাসানা (ভাল) বলেছেন। কিন্তু এই ফকীর উক্ত বিষয়ে তাদের সহিত এক মত হতে পারে নাই। কোন বিদ'আতকেই হাসানা জেনে করতে পারিনি। কারণ নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন: বিদ'তের প্রত্যেকটিই গোমরাহী। সুন্নতকে সমুজ্জল তারকা বলে মনে করা উচিত । যা গোমরাহীর অন্ধকার রাত্রে পথ প্রদর্শন করে, (এ যুগে আলেম গণকে আল্লাহ্ তায়ালা তাওফীক দান করুক) তারা যেন কোন বিদ'আতকে হাসানা বলিয়া আখ্যা না দেন এবং কোন বিদ'আত কাজ করতে ফতোয়া না দেন ।

বর্তমানে বিদআত প্রকাশের প্রাচুর্য্যে সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারের সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে এবং সুন্নাতের নূর এ অন্ধকারের সমুদ্রে এখানে সেখানে জোনাকী পোকার মিটি মিটি আলো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি আরো বলেন: বর্তমান যুগের ছুফিদের ও উচিত যেন তারা ইনসাফের সহিত ইসলামের দুর্বলতা ও মিথ্যা প্রসারের দিকে লক্ষ্য

করে সুন্নাতের গন্ডীর বাহিরে নিজের পীরের ও অনুসরন না করেন। এ নিত্যনতুন বিদ'আতী কাজকে পীরের আমল মনে করিয়া না করেন। সুন্নাতের অনুসরন অবশ্যই মুক্তি দাতা ও বরকত ময়। সুন্নতের বাহিরে সমুহ বিপদ বিদ্যমান।

তিনি অন্যস্থানে লিখেছেন:

> তরীকত ও হাকীকত যা সুফীদের বৈশিষ্ট্য তা শরীয়তের তৃতীয় অংশ এখলাস কে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য; সুতারং এই দুইটি উপার্জন লাভ করার এক মাত্র উদ্দেশ্য শরীয়ত কেই পূর্ণ করা, অন্য কিছু নয় ।

এই তরিকতের পথে সুফীগণ যে বিশেষ অবস্থায় উপণিত হন যথা ভাবাবেগ ,গুপ্ততত্ব ও সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি তা আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং তা খেয়াল ও মায়া মরিচিকা মাত্র ; যা দ্বারা তরীকতের শিশুদের লালন পালন করা হয় মাত্র। এ সমস্ত অতিক্রম করে রেজামন্দির মঞ্জিলে পৌঁছাতে হবে। এটা সুলুকের মঞ্জিল সমুহের মধ্যে শেষ মঞ্জিল। যেহেতু তরীকত ও হাকীকতের মঞ্জিলসমুহ অতিক্রম করার একমাত্র উদ্দেশ্য এখলাছ উপার্জন করা। যাদ্বারা সন্তোষের মঞ্জিল পাওয়া যায়। অদূরদর্শীরা এসমস্ত বিশেষ অবস্থা ও ভাবাবেগকেই আসল মাকসুদ বলে মনে করেন। মোশাহেদা ও তাজাল্লি কে আসল উদ্দেশ্য করে নেন । কাজে কাজেই তারা খেয়াল ও মায়া মরিচিকার কারাগারে আবদ্ধ থেকে শরীয়তের পূর্ণতা) হতে বঞ্চিত থাকেন। তিনি আরো বলেন :

> কেয়ামতের দিন শরীয়তের কথাই জিজ্ঞাসা করা হবে। তাছাওয়াফ, মারেফাতের কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না। বেহেশতে যাওয়া ও দোযখ হতে বাঁচা শরীয়তের কার্যের দ্বারাই লাভ হবে। নবী-রসুলগণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব; তারাও এ শরীয়তের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন। তাঁদের প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য এ শরীয়তেরই প্রচার করা । তাই শরী'য়ত জারি করার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করাই সর্ব শ্রেষ্ঠ নেক কাজ।

তিনি অন্যত্র লিখেছেন :

> এ সময় যে সমস্ত অলসতা ধর্মীয় কাজে প্রচলিত হচ্ছে তা আমলহীন উলামাদের দ্বারাই হচেছ। তিনি বলেন: সুন্নতের সমুজ্জল নূরকে বিদআতের অন্ধকারে আবৃত করে রেখেছে। মিল্লাতে মোহাম্মাদিয়া (দ্বীন ইসলাম) কে কু প্রথার কলুষতায় নষ্ট করে ফেলেছে।

অধিকতর আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর আলেম এই সমস্ত নিত্য নতুন বিদ'আতকে ভালো কাজ বলে মনে করেন এবং তাকে বিদ'আতে হাসানা বলে অভিহীত করেন। ধর্মের পরিপূর্ণতা এ সমস্ত দুস্কার্যের মধ্যেই অনুসন্ধান করেন। আর এ সমস্ত অপকর্ম করার জন্য জন সাধারণ কে উৎসাহীত করেন। তারা এটি জানেনা

যে, ধর্ম এ সমস্ত নব-সৃষ্ট বিদ'আত ও কু প্রথার আবির্ভাবের বহু পূর্বেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

> আজিকার দিনে আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার শুভাশীষ নিঃশেষ বর্ষন করলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে আমার সন্তোষ ও সম্মতী দিলাম।।

বিদআত নামক অপকর্মের দ্বারা ধর্মের পরিপূর্ণতা চাওয়ার প্রকৃত অর্থ এই আয়াতের সারাংশ কে অস্বীকার করা এবং ধর্মকে অসম্পূর্ণ মনে করে সম্পূর্ণ করার কাজে খোদা ও রাসুলের সাথে অংশীদার দাবী করা। (নাউজুবিল্লাহ)

তিনি আরও লিখেছেন:

> সুতরাং আওলা বা আপজাল কর্মের খেয়াল রাখা ও মাকরুহ কার্য্য হতে বেঁচে থাকা যদিও তা মাকরুহে তান্‌জীহ্ হোক না কেন। যিকির, ফিকির ও মুরাকাবা এবং তাওয়াজ্জুহ হতে বহুগুন উত্তম। তাই সুন্নাতই সাফল্যতা লাভ করার মাপকাঠি। অন্যথায় সফলতা দূরহ।

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, বিদ'আত পীর, আউলিয়া, বুযুর্গ যার থেকেই হোকনা নেক সর্ব সম্মতি ক্রমে বর্জনীয়। কোন বিদ'আতকে পীরের অজিফা বলে আমল করার সুযোগ শরী'য়াতে নেই।

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে বাতিল পীরের ধোকা হতে রক্ষা করুন।

সমবেত জিক্র করা বিদ'আত

আল্লাহর জিকর করা একটি উত্তম ইবাদত। অনুরূপভাবে দুয়া করাও উত্তম ইবাদত। এগুলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। কিন্তু সেই দু'আ ও জিকর নিঃসন্দেহে হতে হবে ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতিতে। বুখারী শরীফের টীকাতে লিখিত হয়েছে যে, জিকর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত দু'আ বা শব্দ পাঠ করা যা পাঠ করার জন্য কুরআন-হাদীসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া যে সমস্ত কাজ করা ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ও মানদুব তাও করা। যেমন কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন, জ্ঞানের আলোচনা, ধর্মীয় পুস্তাকাদি পাঠ ও পর্যালোচনা ইত্যাদিও জিকরের অন্তর্ভূক্ত। (বুখারীঃ ২খন্ড, ৭৪৮ পৃ)

হযরত মুজাদ্দিদে আলফ সানী (রহ) বলেন, যে আমল শরীয়ত অনুযায়ী হবে, তা যিকরের অন্তর্ভূক্ত, হোক না তা ক্রয়-বিক্রয়। (মাকতুবাতঃ ২য় খন্ড, ৪২পৃ.)
একই কিতাবের অন্য স্থানে তিনি বলেন,

> সব সময় আল্লাহর স্মরণে হোক না আহার ও বিহারসহ অন্যান্য কাজ নিমগ্ন থাকা উচিৎ। অর্থাৎ যে কোন কাজ যদি শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে আদায় হয় তবে তা জিকর বলে গণ্য হবে। কাজেই শরীআত মোতাবেক চললে মানুষের পুরা সময়টাই জিকরের মধ্যে অতিবাহিত হবে।

হযরত জজরী (রহ) বলেন,

وَلَيْسَ فَضْلُ الذِّكْرِ مُنْحَصِرًا فِى التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ بَلْ كُلُّ مَن يُّطِيْعُ اللّٰهَ تَعَالٰى فِىْ عَمَلِه فَهُوَ ذَاكِرٌ، مرقات، ج ٤، ص ٤٩)

তাহলীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) পাঠের মধ্যে জিকিরের ফযীলাত সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে কেউ আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কোন কাজ করে সেই জিকির কারীরূপে বিবেচিত।

(মিরকাতঃ ৫ খন্ড, ৪৯ পৃ.)

উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শুধুমাত্র মুখে দুআ-দরূদ, তাকবীর-তাহলীল পাঠের নাম জিকর নয়; বরং সর্বাস্থায় ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী চলার নামই জিকর।

রসুলে করীম (স.) ও সাহাবায়ে আজমাইনগণের আদর্শ বর্জন করে মনগড়া পদ্ধতিতে জিক্‌র করলে তা আল্লাহর দরবারে জিক্‌র হিসেবে গণ্য হবে না।
পবিত্র কুরআনের সূরা আ'রাফে জিক্‌র করার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এভাবেঃ

اُذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ (سورة الاعراف، الاية)

তুমি সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালন কর্তাকে আপন মনে স্বল্প স্বরে ক্রন্দনরত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায়। (সূরা আরাফঃ আয়াত-----)

উক্ত আয়াতে কারীমায় নিঃশব্দে ও স্বশব্দে জিক্‌র করার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। নিঃশব্দে জিক্‌র করা সম্পর্কে বলা হয়েছে واذكر ربك فى نفسك নিজের প্রতিপালককে স্মরণ কর নিজের মনে। এই মনে স্মরণ করারও দুটি উপায় রয়েছে। যথা-

এক. জিহবা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লার সত্ত্বা ও গুণাবলীর ধ্যান করা। একে জিক্‌রে ক্বলবী (আত্মিক জিক্‌র) বা তাফাক্‌কুর (নিবিষ্ট মনে চিন্তা) বলা হয়।

দুই. ধ্যানসহ মুখে ক্ষীণ শব্দে আল্লাহর নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করা।

অন্তরে উপলব্ধির সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করাটাই হলো জিক্‌রের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট উপায়। আবার মুখে উচ্চারণ না করেও যদি শুধুমাত্র অন্তরে ধ্যান মগ্ন দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাতেও সওয়াব রয়েছে। কিন্তু জিকরের সর্ব নিম্ন স্তর হলো অন্তরকে বিমূখ রেখে শুধু মুখে জিক্‌র করা।

জিকরের দ্বিতীয় পন্থা সম্পর্কে উক্ত আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে دون الجهر من القول নিম্ন স্বরে। অর্থাৎ স্বশব্দে জিক্‌র করার স্বাধীনতাও প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে। তবে তার একটি সীমা রেখা রয়েছে। তা হলো উচ্চ শব্দে (বর্তমানে মাইক বা শব্দ বর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে) না করা। স্বল্প স্বরে করতে হবে যাতে অন্যের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় বা অন্য ব্যক্তি তার জন্য বিরক্তি বোধ না করে। যদি তা না করে উচ্চ স্বরে করা হয় তবে তার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যার উদ্দেশ্যে জিক্‌র করা হচ্ছে তার মর্যাদাবোধ অন্তরে নাই। সেই মহান সত্ত্বার জন্য সম্মান, ভয় মনে থাকলে তার সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ উচ্চ স্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই সাধারণ জিক্‌রই হোক বা কুরআন তেলাওয়াত হোক যখন করা হবে, তখন খেয়াল রাখতে হবে যেন তা প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বরে না হয়। (মায়ারেফুল কুরআন)

সূরা আরাফের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশান করেনঃ

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (سورة الاعراف)

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কাকুতি-মিনতিসহ গোপনে আহবান কর। নিশ্চয় তিনি সীমা অতিক্রমকারীকে ভাল বাসেন না। (আরাফঃ আয়াত----)

উক্ত আয়াতে কারীমায় জিক্‌র এবং দুআর জন্য দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যথা-

এক. জিক্‌র এবং দুআ অত্যন্ত বিনয় ও ইখলাসের সাথে হতে হবে।

দুই. নিম্নস্বরে এবং গোপনে হতে হবে। কারণ আল্লাহ সীমাঅতিক্রম করা পছন্দ করেন না।

উল্লিখিত আয়াত দুটিতে মূলত আল্লাহ পাক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবং নিম্ন আওয়াজে অথবা সাধরাণ উচ্চ স্বরে জিক্‌র করার জন্য শিক্ষা প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরামগণ একদা উচ্চ স্বরে জিক্‌র করলে রসূলে করীম (স.) তাদেরকে নিঃশব্দে জিকর করার নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا (رواه البخارى : مشكوت المصابيح ، ٢٠١ ص)

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি রহম কর। তোমরা বধির অথবা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। তোমরা ডাকছো সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বনিকটবর্তী মহান সত্তাকে। (বুখারীঃ মিশকাতঃ ২০১)

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রসূল (স.) উচ্চস্বরে জিক্‌র করা পছন্দ করতেন না।

আল্লামা ত্ববরি বলেনঃ

وَفِيْهِ كَرَاهِيَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَ بِهِ قَالَ عَامَّةُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ

(حاشية بخارى، ج ١، ص ٤٢٦)

উচ্চস্বরে জিক্‌র ও দুআ করা মাকরুহ (গর্হিত কাজ)। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মত এটি। (বুখারীর টীকাঃ ১ম খন্ড, পৃ. ৪২০)

আল্লামা ইবনে বাত্বাল বলেনঃ

المذاهب الاربعة على عدم استحبابه ، (البداية والنهاية ومثله فى حاشية بخارى ، ج١ ، ١١٦)

চার মাযহাবের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, উচ্চস্বরে তাকবীর (নামাজ ছাড়া) ও জিক্‌র করা মুস্তাহাব নয়। (বুখারীর টীকাঃ ১ম খন্ড, পৃ. ১১৬)

আল্লামা স্যার ফরাজখান (রহ.) এ ব্যাপারে বলেন যে, সমস্ত দলীলের প্রতি লক্ষ্য করলে এ সত্য উপলব্ধি হয় যে, জিক্‌র এবং দুআ নিম্ন স্বরেই হওয়া বঞ্ছনীয়। চার ইমাম এই বিষয়ে একমত।

কোন বিষয়ে যদি চার ইমাম ঐক্যমত পোষণ করেন, তবে আশা করা যায় যে, সত্য তাদের সাথেই আছেন। হযরত ইমাম নববী (রহ.) মুসলিম শরীফের ব্যখ্যায় লিখেছেনঃ

وَنَقَلَ اِبْنُ بَطَّالٍ وَ اٰخَرُوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوْعَةِ وَ غَيْرِهِمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلٰى عَدْمِ اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِيْرِ راه سنت ،

ইবনে বাত্বাল এবং অন্যান্য ধর্মীয় পন্ডিতগণ বর্ণনা করেন যে, মাযহাব এবং গাইরে মায়হাব সকল অনুসারীরা এ বিষয়ে একমত যে, উচচস্বরে তাকবীর (নামাজ ছাড়া) ও জিক্‌র করা মুস্তাহাব নয়। (রাহে সুন্নাত)

আবু দাউদ শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ اَلَا اَنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهٗ فَلَا يُؤْذِيَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِى الْقِرَاءَةِ اَوْ قَالَ فِى الصَّلٰوةِ (ابو داؤد)

রসূলে করীম (স.) মসজিদে এতেকাফ করাকালীন সময়ে (একদা) সাহাবায়ে কেরামগণকে উচ্চস্বরে (কুরআন) পড়তে শুনে পর্দা উঠিয়ে বললেন, শুনে রাখ নিশ্চয় তোমারা সবাই তোমাদের প্রভুর সাথে কথা বলছো। সুতরাং তোমরা কেউ অন্যকে কষ্ট দিবেনা এবং অন্যের আওয়াজ হতে (কিরাত-জিকিরে) উচ্চ করবে না অথবা নামাজ সম্পর্কে এরূপ বলেছেন। (আবু দাউদ)

আল্লামা হালবী হানাফী বলেনঃ

وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِلْأَمْرِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اُدْعُوْا رَبَّكُمْ الخ ، (كبيرى ـ ص ٥٦٦)

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট উচ্চস্বরে জিক্‌র করা বিদ'আত এবং আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা স্বীয় প্রভুকে কাকুতি-মিনতি ও গোপনে আহবান কর।

উক্ত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট জানা গেল যে, স্বশব্দে জিক্‌র করা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নিকটও খারাপ বিষয়। বরং তা আল্লাহর বাণীর বিপরীত। এবং বিদ'আত। (হলবী কাবীরঃ ৫৬৬ পৃ.)

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেনঃ

وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِاَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ فِى الْمَسْجِدِ وَلَوْ بِالذِّكْرِ حَرَامٌ، مرقات، ج ٢، ص ٤٧٠)

আমাদের কিছু উলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদে উচ্চস্বরে কিছু বলা হারাম, যদিও তা জিক্‌রের মাধ্যমে হয়।

(মিরকাতঃ শরহে মিশকাতঃ ২/ ৪০)

এ পর্যন্ত জিক্‌র সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে এ সত্যটি স্পষ্ট হলো যে, জিক্‌র নীরবেই করা বাঞ্ছনীয়। অতি উচ্চস্বরে জিক্‌র করা পরিপুর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আনেক ওলামায়ে কেরাম উচ্চস্বরে জিক্‌র করাকে বিদ'আত বলেছেন। অনেকে মসজিদে উচ্চস্বরে জিক্‌র করাকে হারাম পর্যন্ত বলেছেন।

বর্তমান যুগে জিক্‌র বিল জাহের-নামে জিক্‌র বিল আজান হচ্ছে, যা কারো নিকটেই বৈধ হবে না। তবে হ্যা, উচচস্বরে জিক্‌রের ব্যাপারে কতগুলো শর্ত আছে। সে শর্তগুলো পাওয়া গেলে তখন বৈধ বলে বিবেচিত হবে। যথা-

ক. রিয়া বা লোক দেখান উদ্দেশ্য হবে না।

খ. অতি উচ্চস্বরে হবে না। (বর্তমানে যা হয়ে থাকে)

গ. উচ্চস্বরে জিক্‌র করাকে সওয়াবের কাজ মনে করা যাবে না।

ঘ. মুসল্লী, ঘুমন্ত বা অসুস্হ ব্যক্তির অসুবিধা হবে না।

ঙ. নিম্নস্বরে জিক্‌র করার থেকে উচ্চস্বরে জিক্‌র করা অধিক ফযিলাতপূর্ণ এই দাবী করা যাবে না।

উক্ত পাঁচটি শর্তের কোন একটির খেলাপ হলে তবে উচ্চস্বরে জিক্‌র করা বৈধ হবে না। সত্যি কথা হলো, বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে ও মাহফিলে জিকিরের যে হাঙ্গামা চলছে তাতে সব কটি শর্তই লজ্ঘিত হচ্ছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে তা জায়েজ হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন ইবাদত শরীয়াত কর্তৃক মুতলাক (শর্ত সাপেক্ষ না হওয়া) হলে তাকে মুকাইয়্যাদ (শর্ত সাপেক্ষ হওয়া) করা অপছন্দীয় কাজ। বরং বিদ'আত। যেমন কোন ইবাদতে শরীয়াত স্বাধীনতা প্রদান করেছে যে, তা যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় করা যাবে। এধরণের ইবাদত করার জন্য নিজ থেকে কোন সময় নির্ধারণ করা বা সমবেত হয়ে আদায় করা বিদ'আত।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنَ الْاَيَّامِ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ (مشكوة، ٣١٢)

তিনি রসূলে করীম (স.) হতে বর্ণনা করেন, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুম'আর রাতকে অন্য রাত হতেনামাজ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করো না। আর জুম'আর দিনকে অন্য দিন হতে রোজ রাখার জন্য নির্দিষ্ট করো না। হ্যা, যদি কোন ব্যক্তি রোজা রাখছে এমতাবস্থায় জুম'আ বার এসে উপস্থিত হয়েছে, তবে অন্য কথা। (মিশকাতঃ ৩১২)

উক্ত হাদীসে নফল রোজা ও নামাজের জন্য জুম'আর দিন ও রাতকে নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই নফল রোজা ও নামাজের জন্য কোন দিন এবং রাতকে নির্দিষ্ট কার বৈধ নয়। আল্লামা শাতেবী (রহঃ) বিদআতের পরিচয় এবং তার অবৈধতার প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَمِنْهَا اِلْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِ عَلٰى صَوْتٍ وَاحِدٍ (حتى ان قال) وَمِنْهَا اِلْتِزَامُ الْعِبَادَاتِ الْمُعَيَّنَةِ فِيْ اَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يُوْجَدْ لَهَا ذٰلِكَ التَّعْيِيْنُ فِى الشَّرِيْعَةِ (الاعتصام، ٣٤)

অনেকগুলি বিদআত হতে একটি বিদআত (কোন নফল ইবাদতের জন্য) বিশেষ কোন সময় ও অবস্থাকে গুরুত্বসহকারে বেচে নেয়া। যেমন সকলে একত্রিত হয়ে একই শব্দে জিকর করা। (আরো একটু অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন) এমনিভাবে নির্দিষ্ট সময়ে এমন কোন ইবাদত করাকে কর্তব্য বানিয়ে নেয়া বিদআত, যাকে শরীয়ত বিশেষ কোন মসয়ের জন্য নির্দিষ্ট করেনি। (আল ইতেসামঃ ১ম, ৩৪ পৃ.)

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) ধর্মকে বিকৃত করার মাধ্যমসূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

وَمِنْهَا اَلتَّشَدُّدُ وَ حَقِيْقَتُهُ اِخْتِيَارُ عِبَادَاتٍ شَاقَّةٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا الشَّارِعُ كَدَوَامِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَالتَّبَتُّلِ وَتَرْكِ التَّزَوُّجِ وَاَنْ يُلْتَزَمَ السُّنَنَ وَالْاٰدَابَ كَالْتِزَامِ الْوَاجِبَاتِ (اِلٰى اَنْ قَالَ) فَاِذَا كَانَ هٰذَا التَّعَمُّقُ اَوِ الْمُتَشَدِّدُ مُعَلِّمُ قَوْمٍ وَ رَئِيْسُهُمْ ظَنُّوْا اَنَّ هٰذَا اَمْرُ الشَّرْعِ وَ رِضَاهُ وَهٰذَا دَاءُ رُهْبَانِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرى ، (حجة الله البالغة ، ج ١ ، ص ١٢٠)

ধর্মকে বিকৃত করার অনেকগুলি মাধ্যমের একটি হলো কঠোরতা অবলম্বন করা। তা হলো এমন কোন কঠোর বিষয়কে নিজের জন্য নির্বাচন করা যা শরীয়াত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। যেমন, একাধারে রোজা রাখা, সারা রাত নফল নামাজ আদায় করা, নির্জনতা অবলম্বন করে বিয়ে-শাদী বর্জন করা এবং মুস্তাহাব কে ওয়াজিবের ন্যায় পালন করা। (তিনি তার পরে বলেন) যখন এইরূপ অতি কঠোরতা অবলম্বনকারী কোন ব্যক্তি যদি কোন সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রশিক্ষক নিযুক্ত হয় তখন উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তার আমলগুলো শরীয়তের হুকুম ও বরণীয় কাজ। এ ধরণের কার্জকলাপ ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় পন্ডিতদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, খন্ড১, পৃ. ১২০)

অর্থাৎ তিনি একথা বলতে চেয়েছেন যে, দ্বীন তার আপন গতিতে চলবে। এখানে কারো মন গড়া আইন চলবে না। আবার শরী'য়ত যে বিষয় পালনকে কর্তব্য করে দেয়নি তাকে কর্তব্য করে নেওয়া যাবে না। এমন অধিকার শরী'য়াত কাউকে দেয়নি। একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে জিকর করা শরী'আত নির্দেশিত আইনের বিপরীত ও বিদ'আত। শরীয়াতের নির্দেশ পালন বান্দার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বরং ইবাদত-বন্দেগীতে, সমাজে পারস্পরিক আচার-আচরণে এবং দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ও শরীয়ার নির্দেশ মেনে চলা আবশ্যক করে দিয়েছে। যেন নফসের তাড়নায় বান্দা দ্বীনকে বিকৃত না করে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অবকাশ না পায়।

প্রখ্যাত ইসালামী আইনবিদ আল্লামা জয়নুল আবেদীন ইবনে নুজায়ীম মিসরী (তাঁকে ২য় আবু হানিফা বলা হয়ে থাকে) বলেন

لِاَنَّ ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا قَصَدَ بِهِ التَّخْصِيْصَ بِوَقْتٍ دُوْنَ وَقْتٍ اَوْ بِشَيْئٍ دُوْنَ شَيْئٍ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوْعًا حَيْثُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ لِاَنَّهٗ خِلَافُ الشَّرْعِ. (بحر الرائق، ج۲، ص ۱۵۲)

এই কারণে আল্লাহর জিকর যখন একটি বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয় এমনভাবে যে অন্য সময়ে তা করা যাবে না, অথবা কোন জিনিসের সাথে যিকর কে এমন ভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যা অন্য জিনিসের সাথে হয় না। এরূপ করা **শরীয়াত** কর্তৃক স্বীকৃত নয়। কারণ এ ধরণের নির্দিষ্ট করা শরীয়াত কর্তৃক প্রমান নেই। তাই তা শরীয়াত পরিপন্থী। (বাহরুর রায়েকঃ খন্ড ২, পৃ. ১৫৯)

অর্থাৎ তিনি একথা বলতে চেয়েছেন যে, যে কোন ইবদাত তা যতই মহৎ হোক না কেন, যদি শরীআত তা করার জন্য নির্দিষ্ট রূপরেখা বর্ণনা না করে থাকে, তাকে **নিজের ইচ্ছা**মত কোন বিশেষ পদ্ধতিতে পালন করা শরীয়াতের বিধান পরিবর্তনের নামান্তর। (রাহে সুন্নাত)

০০০

সমবেত জিকরকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী

সমবেত জিকর করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর একটি বর্ণনার সারাংশ নিম্নরূপঃ

হযরত হাকেম ইবনে মুবরাক বলেন, ওমর ইবনে ইয়াহিয়া এর দাদা বলেন, আমরা ফজরের সালাত আদায় করার পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর দ্বারে বসে থাকতাম। তিনি ঘর থেকে বের হলে আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। একবার এমতাবস্থায় হযরত আবু মুছা আশআরী (রা.) এলেন। তিনি এঅবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু আব্দুর রহমান (ইবনে মাসউদ) বাড়ি হতে বের হয়ে গেছেন? আমরা উত্তরে **না** বললাম। তিনি আমাদের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় ইবনে মাসউদ বাইরে এলেন। আমরা সবাই তার কাছে গেলাম। হযরত আবু মুছা আশআরী তাকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান একটু আগে আমি মসজিদের অভ্যন্তরে যে দৃশ্যের অবতারণা দেখলাম, যাকে আপনি খারাপ ও অপছন্দ মনে করেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি সে কাজকে ভাল মনে করি। হযরত ইবনে মাসউদ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি কোন কাজ? তিনি বললেন, আপনি জীবিত থাকলে স্বচক্ষেই তা দেখতে পাবেন। আমি দেখেছি যে, কিছু লোক গোলাকার হয়ে সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক গোলাকার লোকের মধ্যে একজন নেতার মত ব্যক্তি রয়েছে। সবার সামনে রয়েছে ছোট ছোট পাথর দানা। যখন নেতা ব্যক্তি একশত বার الله اكبر পড়তে বলছে, তখন সকলেই একশত বার পাঠ করছে। যখন সে একশতবার لا اله الا الله পড়তে বলছে, তখন সবাই একশতবার لا اله الا الله পড়ছে। যখন সে একশত বার سبحان الله পড়তে বলছে, তখন সবাই তা পাঠ করছে।

হযরত আব্দুলা ইবনে মাসউদ বললেন, আপনি কি তাদেরকে কিছু বলেছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ না, আপনার মতামতের অপেক্ষাতে আছি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, আপনি কেন তাদেরকে বললেন না যে, তারা তাদের অকল্যাণ গণনা করছে। আর আপনি তাদের জন্য যামিন হতেন যে, (তারা তাওবা করলে) তাদের নেক আমলসমূহ বিনষ্ট করা হবে না।

এরপর তাঁরা সকলে মসজিদে রওনা হলেন। আমরাও তাদের পিছু নিলাম। তিনি মসজিদে এসে একটি জামায়েতের নিকট গিয়ে ধমক দিয়ে বললেনঃ যা তোমরা করছ তা কি? তারা উত্তর দিলো হে আবু আব্দুল্লাহ! এহলো কংকর, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর জিক্র করছি। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের অপরাধ গণনা করছো। তোমরা বিরত থাক, আমি যামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন নেক আমল বিনষ্ট করা হবে না। হায় তোমাদের ধ্বংস! হে উম্মতে মুহাম্মদী, তোমাদের ধ্বংস কত নিকটবর্তী। এখনো পর্যন্ত অসংখ্য সাহাবী জীবিত রয়েছে, হুজুর (স.) এর বস্ত্র এখনো পুরাতন হয়নি, তাঁর ব্যবহারিত পাত্র এখনো ভেঙে যায় নি। ঐ মহান সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় তোমরা হয়ত এমন এক মতবাদের উপর আছ যা মুহাম্মদ (স.) এর তরীকা হতে বেশী হেদায়েত প্রাপ্ত অথবা তোমরাই সর্বপ্রথম পথভ্রষ্টের দ্বার উন্মোচনকারী। তারা বললো, হে আবু আব্দুর রহমান, আল্লাহর কছম, আমরা খারাপ কিছু করছি না। তিনি বললেন, এমন অনেক লোক আছে যারা ভালোর ইচ্ছা করে কিন্তু বাস্তবে তারা কল্যাণে পৌছাতে পারে না।

হুজুর ইরশাদ করেছেন, অনেক লোক এমন আছে যারা কুরআন পাঠ করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করে না) আল্লাহর কসম আমার জানা নাই, হয়ত তাদের অধিকাংশ লোক হবে তোমাদের ন্যায় এমন লোক। অতপর ইবনে মাসউদ সেখান থেকে ফিরে গেলেন। (দারামীঃ খন্ড ১, পৃ.৬৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সমবেত জনতাকে বুঝাতে চেয়ে ছিলেন যে, যদিও তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ্ এর অনেক ফযীলাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তথাপি তার জন্য বিশেষ কোন নিয়ম রসূল ও সাহাবীদের হতে দির্নিষ্ট নাই। কাজেই এমন নতুন পদ্ধতির আবিস্কার বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত।

উচ্চস্বরে সম্মিলিত জিক্‌রকারীদের মসজিদ হতে বিতাড়ন

দরূদশরীফ পাঠ করা একটি মতৎ ইবাদত। কিন্তু তার জন্য পদ্ধতি হলো একা একা ও নিম্নস্বরে পাঠ করা। অন্যথায় সওয়াবের আশা করা দূরাশা ছাড়া কিছু নয়। ফাতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া প্রণেতা উচ্চস্বরে জিক্‌র করা সম্পর্কে বলেনঃ

عَنْ فَتَاوٰى قَاضِى اَنَّهٗ حَرَامٌ لِمَا صَحَّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ اَخْرَجَ جَمَاعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ يُهَلِّلُوْنَ وَ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهْرًا وَقَالَ لَهُمْ مَا اَرَاكُمْ اِلَّا مُبْتَدِعِيْنَ. شامى ج ٢، ص ٣٥٠، فتاوى بزازية : ج ٣، ص ٣٧٥)

তিনি কাজী সাহেবের ফাতওয়া হতে বর্ণনা করেন যে, উচ্চস্বরে জিক্‌র করা হারাম। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা হযরত আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ হতে প্রমাণিত যে, তিনি মসজিদ হতে একটি দল কে এজন্য বের করে দিয়েছিলেন যে, তারা উচ্চস্বরে

لا اله الا الله এবং দরূদশরীফ পাঠ করছিল। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে বিদআতী মনে করি।

(ফাতওয়ায়ে শামী। খন্ড ২, পৃ. ৩৫০ ঃ ফাতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়াঃ খন্ড ৩, পৃ ৩৭৫; ফাতওয়ায়ে আলমগীরির টীকা)

মসজিদ হতে সে দলের বহিস্কারের কারণ ছিল একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে জিকর ও দরূদ পাঠ করা। অথচ এ নিময় রসূল (স.) ও তার সাহাবীদের যুগে ছিল না। তাই তিনি এ পদ্ধতিকে বিদ'আত আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মূলত সাহাবায়ে কেরামদের পথই হেদায়েতের পথ। রসুলে করীম (স.) ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বলেছেন, যে বিষয় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ পছন্দ করেন, আমিও তোমাদের জন্য তা পছন্দ করি। (এতেসামঃ খন্ড১, পৃ. ৩৫৯)

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, ইবনে মাসউদ খোলাফায়ে রাশেদীনদের হতেও বড় (কিতাবী জ্ঞানের) পন্ডিত। (শরহে মুসলিমঃ খন্ড ২, পৃ. ২৩৯)

কাজেই যারা হালকায়ে জিক্‌র-এর নামে সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে চিৎকারের মত (শব্দ বর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে) জিক্‌র করে তাদের বিষয়টি চিন্তা করে দেখার অবকাশ আছে বৈকি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ পদ্ধতিকে বিদ'আত বলে ঘোষণা করেছেন এবং এহেন কাজ দেখে তিনি অসুন্তষ্টি প্রকাশ করেছেন। কাজেই বুঝা গেল রসূল (স.) এর যুগে এ পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। কাজেই যারা প্রকৃত রাসুল প্রেমিক তাদের কর্তব্য হালকায়ে জিক্‌র এর নামে এহেন কাজকে পরিহার করা।

০০০

রসূল (স.) নির্দেশিত পদ্ধতি ব্যতীত কোন জিক্‌র গ্রহণযোগ্য নয়

প্রতিটি ইবাদত রসূল করীম (স.) এর নির্দেশিত পথে হওয়া বাঞ্ছনীয়; নতুবা তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ সংক্রান্ত হযরত আলী (রা.) হতে একটি বর্ণনায় এসেছেঃ

إِنَّ رَجُلًا يَوْمَ الْعِيْدِ اَرَادَ اَنْ يُّصَلِّىَ قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فَنَهَاهُ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يُعَذِّبُ عَلٰى الصَّلٰوةِ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يُثِيْبُ عَلٰى فِعْلٍ حَتّٰى يَفْعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْيُحِثُّ عَلَيْهِ فَتَكُوْنُ صَلٰوتُكَ عَبَثًا وَالْعَبَثُ حَرَامٌ فَلَعَلَّهُ تَعَالٰى يُعَذِّبُ بِهٖ لِمُخَالِفَتِكَ رَسُوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شرح مجمع البحرين وكذا فى الجنة ـ ص ١٦٥ ـ ا ه سنت)

এক ব্যক্তি ঈদের দিন ঈদের নামাজ আদায়ের পূর্বে নফল নামাজ আদায় করতে চেয়েছিল। হযরত আলী তাকে তা করতে নিষেধ করলে সে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন, আমি অবগত আছি যে, সালাত আদায় করার কারণে আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দিবেন না। উত্তরে হযরত আলী বললেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আল্লাহ তেমন কাজের প্রতিদান দিবেন না যতক্ষণ না প্রমাণিত হবে সে কাজ রসূলে করীম (স.) করেছেন অথবা তার প্রতি তিনি উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং তোমার এ নামাজ অনর্থক কাজ বলে বিবেচিত হবে। আর অনর্থক কাজ করা হারাম। হতে পারে আল্লাহ্ পাক তোমার এই কাজ রসূলের বিরুদ্ধচারণ হেতু শাস্তি প্রদান করবেন।

(শরহে মাজমাউল বাহরাইন; আল জুন্নাহ ১৬৫পৃ.; নজমুল বয়ানঃ ৭৬ পৃ)

জানা গেল যে, ঈদের নামাজের পূর্বে রসূলে করীম (স.) কখনো নফল নামাজ আদায় করেন নি এবং আদায় করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহও প্রদান করেন নি। কাজেই এরূপ সময়ে নফল নামাজ আদায় করা রসূল (স.) এর আদর্শের পরিপন্থী।

কাজেই তা বর্জনীয়। কেননা নফল নামাজ উত্তম ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তা সঠিক সময়ে ও সঠিক পন্থায় আদায় না করার কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। সুতরাং জিক্‌র যদি রসূলের আদর্শের বিপরীত হয় তবে তা গ্রহনীয় হবে না।

উচ্চস্বরে জিক্‌র সম্পর্কে আলেমদের মতামতঃ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, কোন নামাজের পরে সমবেত হয়ে গুরুত্বের সাথে উচ্চস্বরে জিক্‌র করা বিদ'আত। তিনি তাঁর দাবীর পক্ষে স্বীয় গ্রন্থ ইমদাদুল আহকামে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৬৯ পৃষ্ঠায় এ বক্তব্যের দলীল বর্তমান। তাছাড়া ফাতওয়ায়ে আব্দুল হাইঃ খন্ড ৪, পৃ. ২৩৩, ফাতহুল বারীঃ খন্ড ২পৃ. ২৬৯; আলউমদাহ লিল আইনীঃ খন্ড ৩, পৃ ১৯৪ দেখা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে উচ্চস্বরে সমবেত হয়ে জিক্‌র করা সম্পর্কে মুফতী **রশিদ আহমদ** (রহ.)-এর মতামত। তিনি বলেন, সমবেত হয়ে উচ্চ স্বরে জিকর করার যে রীতি আমাদের দেশে চালু রয়েছে তার প্রমাণ শরীআতে নেই। বরং তা মকরুহ। প্রমানস্বরূপ তিনি বলেন,

كَمَا فِي شَرْحِ التَّنْوِيْرِ هَلْ يَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ قِيْلَ نَعَمْ ، وَقَالَ فِيْ الشَّامِيَّةِ قَوْلُهُ (قِيْلَ نَعَمْ) يُشْعِرُ بِضُعْفِهِ مَعَ اَنَّهُ

مَشٰى عَلَيْهِ فِى الْمُخْتَارِ وَ الْمُلْتَقٰى فَقَالَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَرِهَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَأتِ الْقُرْأنِ وَالْجَنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيْرِ الخ (شامية كتاب الحظر والاباحة ، احسن الفتوى ، ١ ص ٣٥٠)

যেমন শরহে তানবীরের মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে, জিক্‌র এবং দু‘আ উচচ স্বরে করা কি মাকরুহ? উত্তরে বলা হয়েছে, হ্যাঁ উচ্চ স্বরে করা মাকরুহ। আল্লাম শামী (রহ.) বিখ্যাত গ্রন্থ শামীতে উল্লেখ করেন,উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর (দূর্বল বাক্যের মাধ্যমে দেওয়ার কারণে) দূর্বল বুঝা যায়। তারপরও মুখতার এবং মুলতাকীর রচয়িতাগণ তাদের গ্রন্থে এ বিষয়টিই অনুসরণ করেছেন এবং দলীল হিসেবে পেশ করেছেন রসূলের বাণী। তিনি কুরআন পড়তে, জানাযাতে, শত্রুর প্রতি অগ্রসর বাহিনীকে এবং নসিহাতের সময় উচ্চ স্বর পছন্দ করতেন না। (আহসানুল ফাতওয়াঃ খন্ড ১, পৃ. ৩৫০)

মসজিদে সমবেত হয়ে জিক্‌র করা প্রসঙ্গে ফাতওয়া

এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন ও মুফতীগণ কর্তৃক তার উত্তর সম্বলিত কয়েকটি ফাতওয়া প্রদত্ত হলোঃ

বরাবর,
মুফতি সাহেব সমিপেষু।
বিষয়ঃ মসজিদ সংক্রান্ত কিছু মাছয়ালা জানার আবেদন।
জনাব,
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা কয়েকটি বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানতে চাই। যথা-

১. আমাদের এলাকায় কিছু মুছল্লী মসজিদে নিয়মিত সপ্তাহে একদিন মাগরিবের নামাজের পূর্বে মসজিদের মাইকে জিকির ও তালিমের জন্য ডাকা ডাকি করে।

২. মাগরিবের ফরজ নামাজের পর আওয়াবীন নামাজ, জিক্‌র ও তালিমের ঘোষণা দেয়। অতঃপর এক জনের নেতৃত্বে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ানোর পর জিকিরের বয়ান করে বাতি নিভিয়ে সমস্বরে উচচ শব্দে জিকির করেন।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদে জিক্‌র করার ব্যাপারে শরীআতের বিধান জানালে কৃতার্থ হবো। প্রকাশ থাকে যে, তারা তাদেরে স্বপক্ষে নিম্ন বর্ণিত প্রমানসমূহ উপস্থাপন করে।

١) وفي حاشية الحموى عن الامام الشعرانى قد اجمع العلماء سلفا و خلفا على استحباب الذكر بالجماعة فى المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصلى او قارى القرآن.. (شامى : ج ١)

٢) اصحاب المذاهب الاربعة قالوا يكره رفع الصوت بالذكر فى المساجد ان ترتب عليه تشويش على المصلين و ايقاظ النائمين والا فلا يكره بل قد يكون افضل الخ. (الفقه على المذاهب الاربعاء، ج ١، ص٨٦)

٣) يكره رفع الصوت بالذكر فى المساجد و قرأة القرآن فيه عند المشتغلين لان فيه منع غيره عن شغله و ان فقد كل ذلك فلا كراهية فيه بل مستحب، (فتوى محيط)

বিনীত
মসজিদ পরিচালনা কমিটি।

দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম হতে প্রেরিত উত্তর

সমাধানঃ

الجواب باسم ملهم الصواب

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর স্মরণ তথা জিক্‌র করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং তার নৈকট্য লাভের উপায়। কিন্তু প্রত্যেক কাজের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। তাই জিক্‌র করার ব্যাপারেও শরীআতের নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আমি পবিত্র কুরআনের ভাষায় জিক্‌রের বিধান উপস্থাপন করতে চাই।

ক. আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۔ القرآن

অর্থাৎ তোমরা স্বীয় প্রতিপালক কে বিনীতভাবে ও চুপিচুপি ডাক। (কেননা) নিশ্চয় তিনি সে সমস্ত লোকদের পছন্দ করেন না যারা সীমা লঙ্ঘন করে।

وَلِاَبِیْ حَنِيْفَــةَ أَنَّ رَفْــعَ الصَّــوْتِ بِــالذِّكْرِ بِدْعَــةٌ مُخَــالِفٌ لِّلْاَمْرِ فِیْ قَوْلِهٖ تَعَالٰی "اُدْعُــوْ رَبَّكُــمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَــةً" الخ

(كبيرى ص ٥٦٦)

ইমাম আবু হানিফ (রহ.) -এর মাযহাবঃ

উচ্চস্বরে জিক্‌র করা আল্লাহর আদেশেত পরিপন্থী। এ সংক্রান্ত আয়াত উপরে বর্ণিত হয়েছে। (কাবীরঃ ৫৬৬ পৃ)

খ. আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

اُذْكُرْ رَبَّكَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

(হে মানব) তোমরা স্বীয় প্রতিপালক কে স্মরণ কর নিজ অন্তরে বিনয় আর ভয়ের সাথে এবং উচ্চস্বরের পরিবর্তে নিম্নস্বরে।

هُوَ عَامٌّ فِی الْاَذْكَارِ مِنَ الْقُــرْآنِ وَالدُّعَــاءِ وَالتَّسْــبِيْحِ وَالتَّــهْلِيْلِ وَغَيْرِ ذٰلِــكَ لِاَنَّ الْاِخْفَــاءَ اَدْخَــلُ فِــی الْاِخْــلَاصِ وَ اَقْــرَبُ اِلٰی حُسْنِ التَّفَكُّرِ۔ تفســير كشــاف، ج ٣، ص ١٩٢، (علمــاء كرام اور صوفياء وقت كــو اس عبــارت كــو بارهــا مطالعــة كرنا چاهیۓ)

গ. আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেনঃ

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَا الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ، القرآن

আর নিজ নিজ চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। আর নিজের স্বর অনুচ্চ করবে। (কেননা) নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই (উচচ শব্দ হওয়ার কারণে) অতি ঘৃণিত। (কুরআন)

(তবে যে সমস্ত স্থানে স্বর উচ্চ করার কথা বলা হয়েছে তা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন আজান দেওয়া, মুকাব্বের এর তাকবীর ইত্যাদি।)

(তাফসীরে রুহুল মানীঃ ১১ খন্ড, পৃ. ৯০)

একদা সাহাবীদেরকে উচ্চ স্বরে জিক্‌র করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে নিষেধ করে বলেছিলেনঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ لَيْسَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا وَاَنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَّهُوَ مَعَكُمْ(بخارى: ج ٢، ص ٦٠٥، مسلم: ج ٢، ص ٣٤٦)

হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের নফসের উপর সদয় হয়। (কেননা) তোমরা সেই সত্ত্বাকে ডাকছ না, যিনি বধির এবং অনুপস্থিত। (বরং) এমন সত্ত্বাকে ডাকছ যিনি সর্ব প্রকার শব্দ (ছোট বড়) শ্রবনেণ সক্ষম এবং সর্বদা তোমাদের কাছে ও সঙ্গে রয়েছেন। (বোখারীঃ খন্ড ২, পৃ. ৬০৫, মুসলিমঃ খন্ড ২, পৃ. ৩৪৬)

উল্লিখিতআয়াতসমূহ ও হাদীসের আলোকে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত যে, নিম্নস্বরে জিক্‌র করাই উত্তম। পরবর্তী কালের সকল আলেমগণ এই কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে সীমা লঙ্ঘন না করে সাধারণ আওয়াজে জিক্‌র করাকে ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ জায়েজ বলেছেন এবং তা পছন্দনীয় জিক্‌রের অন্তর্ভৃক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালের কিছ ছুফী-সাধকগণও এই মত পোষণ করেছেন। বলা বাহুল্য সীমা লঙ্ঘন করে উচ্চস্বরে জিক্‌র করাকে কেউ জায়েজ বলেন নাই। উলামাগণ এবং আইনবিদগণ থেকে যে সমস্ত দলীল দ্বারা উচ্চস্বরে জিকর করার প্রমান মেলে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সীমা লঙ্ঘন না করে সাধারণত আওয়াজে জিক্‌র করা। মন্নে রাখতে হবে চার মাযহাবের ইমামগণ যে বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন সাফল্য তার মধ্যেই।

উল্লেখ থাকে যে, এই দ্বিতীয় প্রকারের জিক্র বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। তা হলো, যেন জিকর দ্বারা কোন মুছল্লী, ঘুমন্ত ব্যক্তি, রোগী বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি ও কষ্ট না হয়। তেমন হলে তাও জায়েজ হবে না। আবার অতিরিক্ত উচ্চস্বরে জিকর করার দ্বারা নিজের শরীরেও ক্ষতি হতে পারে। সেদিকে খেয়াল রাখা বঞ্ছনীয়। তালে তালে সমস্বরে উচচস্বরে জিকর করা নাজায়েজ। এটি সীমা লঙ্ঘনেরই নামান্তর। কাজেই অজ্দের নামে লাফা লাফি করা বৈধ নয়। যদি অনিচ্ছাকৃত হয়ে থাকে তবে তার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। কেননা এগুলো ভন্ড ভান্ডারীদের প্রথা।

ألف) فَفِيْهِ (فِي الْحَدِيْثِ الْمَذْكُوْرِ فِي الْبُخَارِى وَمُسْلِمٍ مَرْاُنِقًا) اَلنَّدْبُ إِلٰى خَفْضِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ إِذَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ عَلٰى رَفْعِهٖ ، شرح مسلم للنووى.

ب) قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ اَلْمَذَاهِبُ الْاَرْبَعَةُ عَلٰى عَدْمِ اِسْتِحْبَابِهٖ ، البداية والنهاية ، راه سنة ، ١٧٦.

ج) وَنَقَلَ اِبْنُ بَطَّالٍ وَ اٰخَرُوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوْعَةِ وَ غَيْرُهُمْ مُتَّفِقُوْنَ عَلٰى عَدْمِ اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالتَّكْبِيْرِ وَ حَمَلَ الشَّافِى هٰذَا الْحَدِيْثَ (اَىْ حَدِيْثَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ) عَلٰى اَنَّهُ جَهَرَ وَقْتًا يَسِيْرًا حَتّٰى يُعَلِّمَهُمْ صِفَةَ الذِّكْرِ لَا اَنَّهُمْ جَهَرُوْا دَائِمًا ، شرح مسلم ، ج ١ ، ص ٢١٧ ، حاشية البخارى ، ج ١ ، ص ١١٩.

د) وَلِذَا مَنَعُوْا عَنِ الْاِجْتِمَاعِ بِصَلٰوَاتِ الرَّغَائِبِ الَّتِى اَحْدَثَهَا بَعْضُ الْمُبْتَدِعِيْنَ لِاَنَّهَا لَمْ تُؤْثَرْ عَلٰى هٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ رد المختار ، ج ٢ ، ص ٢٣٥.

ঙ) قَدْ يَكُوْنُ اَصْلُ الْعَمَلِ مَشْرُوْعًا وَلٰكِنَّهٗ يَصِيْرُ جَارِيًا مَجْرَى الْبِدْعَةِ مِنْ بَابِ الذَّرَائِعِ كِتَابُ الْاِعْتِصَام ج ٢، ص ٩٢، بحواله امداد المفيين ص ٩٧٣.

চ) فِى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَ اِزْعَاجُ الْاَعْضَاءِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ جَهْلٌ وَاِنَّهَا هِىَ دُعَاءٌ لَهٗ وَالدُّعَاءُ يَكُوْنُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ الخ وَفِى رَدِّ الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الَّذِيْنَ يَدَّعُوْنَ الْوَجْدَ وَالْمُحَبَّةَ لَا اَصْلَ لَهٗ وَ يَمْنَعُ الصُّوْفِيَّةُ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَ تَخْرِيْقِ الثِّيَابِ الخ.

ছ) پس چنگ زدن بسنت اگر چه اندك باشد بهتر ست از نو پدید کردن بدعت اگر چه حسنة بود، زیراکه باتباع سنت بیدامی شود نور و بکر فتاری بدعت درمی آید ظلمت مثلاً رعایت آداب خلاء و استنجاء بروجه سنت بهتر ست از بنائ مدرسة و رباط. (اشعة المعات ص ١٤٧)

জ) پس رعایت اولی و اجتناب از مکروه اگرچه تنزیهی باشد فکیف تحریمی بمراتب ذکر و فکر و مراقبة و توجه بهتر باشد. (مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثان رح، ج ١، ص ٣٩)

ঝ) كَمْ مِنْ مُبَاحٍ يَصِيْرُ بِالْاِلْتِزَامِ مِن غَيْرِ مُلْزِمٍ وَ التَّخْصِيْصِ مِنْ غَيْرِ مُخَصِّصٍ مَكْرُوْهًا كَمَا بِهٖ صَرَّحَ فِى شَرْحِ الْمِشْكٰوةِ وَ الْحَصْكَفِىْ فِى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَفِى الْمَجْمَعِ اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ اَنَّ الْمَنْدُوْبَ اِذَا خِيْفَ اَنْ يُرْفَعَ مِنْ رُتْبَتِهٖ يَنْقَلِبُ مَكْرُوْهًا (هداية العباد)

মূল কথা, আমরা কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী আইনবিদদের বাণীকে বিশুদ্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উম্মতের কাছে পৌঁছান একান্ত দ্বীনি দায়িত্ব মনে করি এবং প্রশ্নকারীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করি। সুতরাং প্রশ্নকারীর প্রশ্ন যদি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে তার জবাবদিহিতা আমাদের নয়। আমরা শরীআতের যথার্থ মর্ম বিশ্লেষণ করে ফাতওয়া প্রদান করলাম। প্রথম ফাতওয়াকে যথার্থভাবে পুণরায় সমর্থন করেছি। আপনাদের অবস্থাকে ফাতওয়ার সাথে মিলিয়ে দেখবেন। যদি আপনারা শরীআতের মিমাংশাকে মেনে নেন তা হলে কোন অভিযোগ থাকবে না। আর যদি শরীআতের পরিপন্থী হন, তবে সংশোধন হবেন।
আল্লাহ! আমাদের সকলকে সঠিক তত্ব বুঝার তাউফিক দান করুন?

আীমন।

اللهم ارنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

উত্তর দাতাঃ
মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর (উখয়ভী)
দারুল ইফতা
দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশে।

الجواب صحيح	الجواب صحيح	الجواب صحيح
نور احمد عفا الله عنه	احمد الله عفا الله عنه	كفاية الله عفا الله عنه
٣٤/٠٤/١٤١٤هـ	٢٤/٠٤/١٤١٤هـ	٢٤/٠٤/١٤١٤ هـ

হাটহাজারী মাদ্‌রাসার ফাতওয়া বিভাগের মুফতী আল্লামা কেফায়াতুল্লাহ সাহেব (দা. বা.) ও আল্লামা জসিম উদ্দীন সাহেবের ফাতওয়া

সমাধানঃ

জিক্‌র একটি ইবাদত এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। কুরআন ও হাদীসে জিকর করা সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে এবং তার ফযিলাতও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুসারে জিক্‌র যা প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে, তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ কুরআন-হাদীস ও সাহাবীদের কর্মে পাওয়া যায় না। বরং ইমাম আবু আব্দুল্লাহ দারিমী কিতাবে সাহাবী যুগের একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন যার দ্বারা অনুরূপ জিক্‌র করার নিষিদ্ধতার প্রমাণ মেলে। ঘটনাটি হলো নিম্নরূপঃ

> একদা হযরত আবু মুছা আশয়ারী দেখলেন কিছু লোক মসজিদে গোল হয়ে বসে পাথর কণা দ্বারা গুনে গুনে আল্লাহর জিক্‌র করছিল। তাদের মধ্যে একজন তাদের কে ১০০ বার আল্লাহু আকবার পড়তে বলছিল । তারা তাই করছিল। এমনিভাবে তাসবীহ-তাহ্‌লীল পাঠ করতেছিল।এ অবস্থা দেখে আবু মুছা আশয়ারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট গেলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলে। তিনি ঘটনা শুনে মসজিদে গেলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের যে কাজ করতে দেখছি তাতো মুহাম্মদ (স.) এর তরীকা নয়। কেননা আমরা তাঁর যুগে কাউকে কখনো এরূপ করতে দেখেনি। কাজেই তোমাদের এ কাজ বিদআত আর তোমরা বিদআতী। অতঃপর তিনি তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত রাখলেন। এ ঘটনা হতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী জিক্‌র করা নিষিদ্ধ। কাজেই তা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

বলা বাহুল্য কয়েকটি শর্ত মোতাবেক উচ্চস্বরে জিক্‌র করা বৈধ আছে। যথা-

- ক. লোক দেখান উদ্দেশ্য হবে না।
- খ. অধিক উচ্চ স্বরে হবে না।
- গ. উচ্চস্বরে জিকর করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করা যাবে না।
- ঘ. জিক্‌র এমন উচ্চস্বরে হবে না যাতে ঘুমান্ত, অসুস্থ্য ও ইবাদতকারী ব্যক্তির কষ্ট ও ব্যাঘাত ঘটে।
- ঙ. উচ্চস্বরে জিক্‌র করাকে নিম্ন স্বরে জিকর করার উপর পাধান্য দেওয়া যাবে না।

উল্লিখিত শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে তা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নে উল্লেখিত নিয়মে জিকরকারীর যে দলীল উপস্থাপন করেছেন, তার মধ্যে উচ্চস্বরে জিকর করার শর্তসমূহ উল্লেখ আছে। কিন্তু তাদের নিয়মে জিকর করার মধ্যে উক্ত শর্তসমূহ অনুপস্থিত। তার মধ্যে আবার সপ্তাতে নির্দিষ্ট দিন বা মাইক ব্যবহার ইত্যাদি কথারও উল্লেখ নেই। কাজেই উল্লিখিত দলীল কে তাদের স্বপক্ষীয় দলীল রূপে উপস্থাপন করা ঠিক হবে না।

دَلَائِلُ عَلٰى مَا قُلْنَا :

عَنْ اَبِى مُوسٰى اَلْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا اِذَا شَرَفْنَا عَلٰى وَادٍ هَلَّلْنَا وَ كَبَّرْنَا وَ ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهَا : فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمْ اِنَّهُ سَمِيْعٌ وَّ قَرِيْبٌ ، بخارى. ج ١. ص ٤٢٠

قَوْلُهُ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اِلخ دَلَّ الْحَدِيْثُ عَلٰى اِسْتِحْبَابِ الْاِسْرَارِ وَ الْمُخَافَةِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهٖ اُدْعُوْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً الخ تَكْمِلَه فَتْحُ الملهم ج ٥، ص ٥٦٥.

قَوْلُهُ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُ مَجْنُوْنٌ مسند احمد، ج ٣، ٧١، قَوْلُهُ مَجْنُوْنٌ يُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ سَبَبُ نِسْبَتِهِمْ اَلْجُنُوْنَ اِلَيْهِ مَا يَرَوْنَهُ مِن اِدَامَةِ الذِّكْرِ وَ اِسْتِغَالِهٖ بِطَاعَةِ اللّٰهِ. الفتح الربانى، ج ١٤، ص ٢٣.

وَمِنْهَا اِلْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ كَالذِّكْرِ بِالْاِجْتِمَاعِ عَلٰى صَوْتٍ وَاحِدٍ اِلٰى اَنْ قَالَ وَمِنْهَا اِلْتِزَامُ الْعِبَادَاتِ فِى اَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يُوْجَدُ لَهَا ذٰلِكَ التَّعْيِيْنُ فى الشريعة. الاعتصام، ١، ٢٨.

সমাধানেঃ
মোস্তফা পাবনবী
ফতোয়া বিভাগ শেষ বর্ষ
হাটহাজারী মাদ্‌রাসা
১২/০৪/১৪২৪ হি

الجواب صحيح
كفاية الله عفى الله عنه
١٤٢٤/٠٤/١٢ هـ

الجواب صحيح
جسيم الدين عفا الله عنه
١٤٢٤/٠٤/٠٩ هـ

০০

আল ইসলামিয়া ক্বওমিয়া ফয়জুল উলুম মাদ্‌রাসা লিচুতলা, বারান্দীপাড়া, যশোর, বাংলাদেশ-এর প্রেরিত ফাতওয়া

সমাধানঃ

প্রশ্নের মূল উত্তরের পূর্বে একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, কুরআন-হাদীসে যে জিকর্-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কোন জিকর্? সেটি জানা না থাকলে আলোচ্য বিষয়ে সঠিক সমাধানে পৌঁছান দূরুহ ব্যাপার।

সাধারণ মানুষ জিকর্ বলতে মৌখিক জিকর করাকেই বুঝে থাকে। অথচ জিকরের অর্থ ব্যাপক। যেমনি ভাবে তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীলকে জিকর্ বলা হয় তেমনি নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকেও জিকর্ বলা হয়। সম্পূর্ণ কুরআনকেই কখনো কখনো জিকর্ বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا الخ যে আমার জিকর্ অর্থাৎ কুরআন হতে বিমূখ হবে তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণময় জীবন।

তাফসীর ও হাদীস বিশারদ ইমাম সায়্যেদ যুবায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহর জিকর্ শুধু তাসবীহ-তাহ্লীলসহ অন্যান্য মৌখিক ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে কোন কাজই আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য অনুযায়ী করা হবে তা-ই জিকর্।
প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আতা (রহ.) বলেন, কোন মজলিশে শরীআতের আহকাম আলোচনা বা শিক্ষা দেওয়া বা সে বিষয়ে গবেষণা করাও জিক্রের অন্তর্ভূক্ত। (আজকারে নববী)

যে সমস্ত হাদীসে যিক্র অথবা হালকায়ে জিক্র-এর কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো তালিম, তায়াল্লুম অথবা ওয়াজ ও নছিহাতের মাহফিল। বর্তমান সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে অনুষ্ঠিত হালকায়ে জিক্র- কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। বরং একত্রিত হয়ে যে পদ্ধতিতে বর্তমানে জিক্র করা হচ্ছে তা সাহাবায়ে কেরামগণ কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। এমন কি এমন জিক্রকারীদেরকে মসজিদ হতে বের করে দিয়েছেন। যেমন ফাতওয়ায়ে কাজীখানে বলা হয়েছে, উচ্চস্বরে জিকর করা হারাম। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় , তিনি এধরণের একটি দলকে মসজিদ হতে বিতাড়ন করেন এবং সে কাজকে তিনি বিদআত মনে করেন বলেও উল্লেখ করেছেন।

(ফাতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়াঃ ৩য় খন্ড, ৩৭৫ পৃ.)

দারামী শরীফের এক বর্ণনাতে এসেছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) একদা কিছু মানুষকে সমবেত হয়ে সমস্বরে জিক্র করা অবস্থায় দেখলেন। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা তো কোন ছোয়াবের কাজ করছ না। বরং তোমরা গোনাহের কাজ করছ।

তাছাড়া নফল আদায়ের জন্য শরীয়ত নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করে জামাতের সাথে আদায় করা অথবা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে বিশেষিত করা সুন্নতের পরিপন্থী।
তাসবীহ, তাহ্লীলসহ যে কোন নফল জিক্র নীরবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রখ্যাত মোহাদ্দিস ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন, সমস্ত মাযহাবের ইমামগণ উচ্চস্বরে জিক্র করা যে মুস্তাহাব নয় সে ব্যাপারে একমত।

(বোখারীঃ ১ম খন্ডের টীকা, পৃ. ১১৬)

জিক্রে জলি (উচ্চস্বরে) সম্পর্কে মতভেদ আছ। কিন্তু অধিকাংশ ওলামাদের নিকট একত্রিত হওয়া ব্যতীত শর্ত সাপেক্ষ বৈধ আছে, যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ঐ শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তা জায়েজ নয়।

প্রশ্নেবর্ণিত দলীলের উত্তরঃ

প্রশ্নে উল্লিখিত ২য় ও ৩য় দলীল দ্বারা তাদের প্রচলিত জিক্‌র বৈধ প্রমাণিত হয় না; বরং তা তাদের মতামতের বিরুদ্ধেই অবস্হিত। তবে কিছু শর্তসাপেক্ষ তা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। যা উপরে আলোচিত হয়েছে। তবে সমবেত হয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে জিক্‌র করা প্রমাণিত হয় নি।

তারা তাদের প্রথম দলীলে হাসিয়ায়ে হামবির যে উদ্ধৃতি পেশ করেছে তার মধ্যে সমবেত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তাই তার উত্তর দেয়ায় স্বচেষ্ট হচ্ছি। সত্যি কথা হলো ওই উদ্ধৃতির দ্বারাও বর্তমান সময়ের প্রচলিত পদ্ধতির জিকর বৈধ বলে প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া হানাফী মাযহাবের উলামাদের নিকট গৃহিত ফাতওয়ায়ে শামীর কিছু মাসয়ালার ব্যাপারে দেওবন্দী মুফতীগণ একমত হতে পারেন নি। তার মধ্যে প্রথম প্রমাণটিও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এটি বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। হযরত আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) ফাতওয়ায়ে শামীর মহামান্য লেখক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন لَمْ تَنْكَشِفْ عِنْدَهُ حَقِيقَةُ الْبِدْعَةِ (আনওয়ারুল মাহমুদঃ শরহে আবু দাউদ)

فيا ايها الاصحاب الكرام! اين انتم من هذه الروايات العديدة وكيف تعملون برواية الحموى والحال ان اكثر الروايات خلافها، الله اعلم وعلمه اتم واكمل،

প্রমাণসমূহঃ

১. কিতাবতুল এতেসামঃ ১ খন্ড, পৃ. ৩৩ ২. আহকামুল আহকামঃ ১ খন্ড, পৃ ৫১
৩. বাহরুর রায়েকঃ ২য় খন্ড,পৃ. ১৫৯ ৪. শামীঃ ২য় খন্ড, পৃ.৩৫০
৫. বুখারী শরীফঃ খন্ড, পৃ. ৬৬ ৬. শরহে মুসলিমঃ খন্ড ১, পৃ. ২৭১
৭. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ১০ খন্ড, পৃ ২৭০
৮. শরহে মুসলিমঃ খন্ড ১, পৃ. ৪৯ ৯. কাবীরঃ ৫৬৬

লেখক

মোঃ নজরুল ইসলাম চাঁপুরী (শিক্ষক)
লিচুতালা ফয়জুল উলুম মাদ্‌রাসা
বারান্দীপাড়া, যশোর, বাংলাদেশ
১৬/০৫/২০০৩

تصور شيخ

(শায়খের ধ্যানমগ্ন)

আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক মাধ্যমের কথা শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পালন করা এবং মদ, সুদ, ঘুষ, গীবত, অশালীন কাজ ইত্যাদি হতে বিরত থাকা। আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং নিষেধকৃত কাজ বর্জন সবই হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ (سورة الهود)

নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। অতপর নূহ তার সম্প্রদায় কে লক্ষ্য করে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী এ কথার উপর যে, তোমরা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আমি তোমাদের উপর কিয়ামতের ভয়াবহ আযাবের আশঙ্কা করছি। (সূরা হুদ)

কাজেই ইবাদত, যিকির, ফিকির, ধ্যান সবই হতে হবে আল্লাহর এবং তার নৈকট্য লাভের জন্য। কোন পীর বা ফকীরের ধ্যান করা যাবে না। বর্তমানে পীর-ফকীরের ধ্যান এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা শির্করে পর্যায় পড়েছে। এ যেন প্রতীমা পূজার অন্য আর এক রূপ। কারণ যারা প্রতীমা পূজা করে তারা আল্লাহকে মূল ও বড় খোদা বলে জ্ঞান করে। তবে প্রতীমাগুলোকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে মনে করে। কাজেই যারা আল্লাহর নিকট পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য পীরদেরকে মাধ্যম মনে করে তাদের ধ্যানে নিমগ্ন হয় তারা অজান্তেই শিরকে লিপ্ত হয়। হযরত ইসমাইল শহীদ (রহ) একে শির্ক বলে আখ্যা দিয়েছেন। ফকীহে যামান মুফতী রশীদ আহমেদ গাঙ্গুহী (রহ) বলেন, তাযীমের সাথে শায়খের ধ্যান করা এবং ধারণা করা শায়খ এব্যাপারে অবগত আছেন, এটি শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। তাই পরবর্তী যুগের অলেমগণ পীরের ধ্যানে মগ্ন হওয়াকে হারাম বলেছেন। বর্তমনে এটি সীমা লঙ্ঘন করে শির্কের পর্যায়ে পৌছে গেছে। (ফাতওয়ায়ে রশীদিয়াঃ ৪০-৪৩পৃ.)

الا الله এর জিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা

যিক্‌র একটি মহৎ ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি উত্তম মাধ্যম। হাদীস শরীফে যিক্‌রকারীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী হতেও উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছেঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ وَ اَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَلذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِى سَبِيْلِ اللهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهٖ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَ يَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً ، رواه احمد ، مشكوة ، ص١٩٩

রসূলে করীম (স.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে? উত্তরে তিনি বলেন, অধিক যিকির কারী পুরুষ ও মহিলাগণ। আবার প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল তারা কি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজী হতেও অধিক মর্যাদাবান হবেন? উত্তরে তিনি বললেন, যদি সে কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে তরবারি ভেঙে ফেলে এবং তলোয়ার রক্তাক্ত হয়, আল্লাহর যিকরকারী তার থেকেও অধিক মর্যাদাবান। (আহমদ, মিশকাতঃ ১৯৯)

এ ধরণের অসংখ্য হাদীস যিক্‌র সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। অন্য দিকে মৌখিক যিক্‌রের বাক্যগুলোও হাদীসে অনেক বর্ণিত হয়েছে। তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ইত্যাদির কথা অসংখ্য হাদীসে এসেছে। বলা বাহুল্য যিক্‌র হিসেবে যতবাক্য রাসুল (স.) থেকে বর্ণিত হয়েছে সবই সম্পূর্ণ বাক্য। যিক্‌রের কোন একটি বাক্য রাসুল (স.) থকে অসম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হয়নি। যেমন হাদীসে এসেছেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ اَلْمَسْجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ. ترمذى ، مشكوة ، ص ٧٠

রসূলে করীম (স.) বলেছেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগিচা দিয়ে অতিবাহিত হবে তখন ফল খাবে অর্থাৎ তাতে তোমরা বিরচরণ করবে। বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগিচা কি? তিনি বললেন, মসজিদসমূহ। আবার প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল রতউন কি? তিনি বললেন, سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر (অর্থাৎ এ তাসবীহ পাঠ করা কেমন যেন বাগিচার ফল ভক্ষণ করা) (তিরমিজী, মিশকাতঃ ৭০ পৃ.)

কিন্তু শুধু الا الله এর যিকির করা যা অনেক আলেম করে থাকেন, তা পরিপূর্ণ বাক্য নয়। অবশ্য যদিও এটিকে পরিপূর্ণ বাক্য এবং তার অর্থ বিশুদ্ধ ধরে নেয়া যায়, তবুও যেহেতু রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন হতে ওরুপ যিক্রের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ তাঁরা সকলেই যিক্র করেছেন। আত্মশুদ্ধির দিক দিয়েও তারা ছিল আমাদের অনেক উর্ধে। দ্বীনের জ্ঞানও তাঁদের ছিল অধিক।তাঁরা ছিলেন হেদায়েতের উজজ্বল নক্ষত্র, সুন্নতের অকৃত্রিম অনুসারী। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতা কাজ করতো না। আমাদের উপর নির্দেশ এসেছে তাঁদের পদাঙ্কনুরণ করার জন্য। যেহেতু তারা শুধু الا الله শব্দ ব্যবহার করে যিক্র করেছেন এমন কোন প্রমাণ নাই, তাই এরূপ যিক্র করাকে উলামায়ে কেরাম বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া যিক্রের বাক্য গুলোর মধ্যে **আমরে তায়াব্বুদী** সর্বাধিক, এখানে ইজতেহাদকরে বাড়ানো বা কমানো সম্ভব নয়। কারণ নামাজের পর যিক্র সম্পর্কে মিশকাত শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، رواه مسلم، سكوت، ٨٨.

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলে করীম (স.) যখন নামাজের সালাম ফিরাতেন আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিন কাস সালাম তাবা রাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম এই দুআ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু বসতেন। (মুসলিম, মিশকাতঃ ৮৮ পৃ)

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মীরকাত-এ বলা হয়েছে অনেকে ومنك السلام এর পরে আরো অনেক বাক্য বৃদ্ধি করে থাকেন। যেমন واليك يرجع السلام

এবং وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ এবং فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ইত্যাদি এর কোন ভিত্তি হাদীসে নাই। অর্থাৎ অতিরিক্ত এই বাক্যগুলো রসূল (স.) পড়েননি। তাই তা মাসনূন যিক্‌র হিসেবে পাঠ করা বিদআত। কাজেই বুঝা গেল যে, রসূল (স.) যে বাক্য পাঠ করে যিক্‌র করেছেন সে ভাবেই পাঠ করে যিকির করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া রসূল (স.) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে সর্বোত্তম যিক্‌র বলেছেন, কেবল মাত্র اِلَّا اللّٰهُ কে নয়। اِلَّا اللّٰهُ সম্পর্কে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়নি, তার ফযিলাত সম্পর্কেও হাদীসে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। কাজেই সঠিক যিক্‌র হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ । এতে অনেক নেকী রয়েছে। কিন্তু اِلَّا اللّٰهُ যিকরের কোন সাওয়াব নাই। কারণ হাদীসে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি।

অনেকে বলতে পারেন তাবীল করার মাধ্যমে اِلَّا اللّٰهُ কে পরিপুর্ণ বাক্য ধরে নেয়া সম্ভব। তার উত্তরে বলা হবে, বাক্য বিশুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে যিকর বানানো যাবে না। যেমন নামাজের পরের যিকর বাড়ানো কে ওলামায়ে কিরাম ইনকার করেছেন। অথচ তার অর্থগুলোও বিশুদ্ধ। এমনিভাবে হযরত ওমর (রা.) এর মজলিসে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলেছিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ। সাথে সাথে তিনি وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ বাড়ানোকে অস্বীকার করেছেন। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত হাদীসে উল্লেখ আছে। তাই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আব্দুস সালাম এবং আরো অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ اِلَّا اللّٰهُ এর যিক্‌র করাকে বিদআত বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ হাদীসে এরূপ কোন বর্ণনা নাই। কাজেই এ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বুজুর্গ ব্যক্তির হাওলা দেয়া ঠিক নয়। কুরআন হাদীসে যার প্রমাণ নেই, এমন বিষয়কে বুজুর্গদের আমল দ্বারা দ্বীনি কাজ সাব্যস্ত করা উচিৎ নয়। আল্লাহ্ সকলকে দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করুন।

ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মোনাজাত সম্পর্কেআলোচনা।

প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজের পর ইমাম মোক্তাদী মিলে সমবেত ভাবে হাত উঠিয়ে যে দুয়া করা হয় তা আদৌ বৈধ নয়। কারণ এ নিময়ে রসূল (স.) নিজে দুয়া করেনি এবং সাহাবীদের যুগেও কেহ করেননি। রসূল (স.) যে আমল নিজে করেননি ও সাহাবীদেরকেও করতে বলেননি এবং সাহাবীদের কেহ করেননি তেমন কাজ পরিহার করা উচিত। হযরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَيْئٍ مِنْ دُعَائِهِ اِلَّا فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ يَرْفَعُ حَتّٰى يَرٰى بَيَاضَ اِبْطَيْهِ. بخارى، ج ١، ص٤١، مشكوة، ١٣١.

রসূলে করীম (স.) কোন নামাজের পরে দুআর জন্য (সম্মিলিতভাবে) হাত উঠান নাই। শুধুমাত্র এস্তেসকার নামাজের পরে (সম্মিলিতভাবে) এমন ভাবেহাত উঠাতেন যে তার বোগল পর্যন্ত দেখা যেত। (বুখারীঃ ১/৪১ পৃঃ মিশকাত ঃ ১৩১ পৃ)

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলে করীম (স.) এস্তেসকার নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজের পর দুআ করার জন্য সম্মিলিতভাবে দুহাত উঠিয়ে দুআ করেননি। ফরজ নামজের পর সাহাবীদের আমল সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا كَانَا اِذَا فَرَغَا مِنَ الصَّلٰوةِ قَامَا كَاَنَّهُمَا عَلَى الرَّضْفِ. بدائع الصانع. ١٥٩

অর্থাৎ ফরজ নামাজের পর হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,ফরজ নামাজের সালাম সমাপ্ত হবার পর তারা এতো তাড়াতাড়ি উঠে যেতেন, মনে হতো যেন তারা গরম পাথরে অবস্হান করেছিলেন।

(বাদায়ে. আস-সানায়ে)

ফরজ নামাজের পরে রসূলে করীম (স.) নিজে দুআ পাঠ করতেন এবং সাহাবীদেরকে দুআ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। কিন্তু সাহাবীদের নিয়ে

একত্রে হাত উঠিয়ে দুয়া করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۔ (مشكوة ، ٨٨ : مسلم)

রসূলে করীম (স.) ফজর নামাজের সালাম ফিরিয়ে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ এই দুয়াটি পাঠ করা পরিমানের অধিক সময় দেরী করতেন না। (মিশকাতঃ ১ম খন্ড, ৮৮)

এই হাদিসে শুধু সংক্ষিপ্ত একটি দু'আ পাঠের কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু তাতে হাত উঠানোর কোন ব্যাপার নাই। কারণ হাদীসে হাত উঠানোর কথা উল্লেখ হয় নাই। এই ধরণের আরো অনেক দুয়া পাঠের স্বপক্ষে হাদীস রয়েছে; কিন্তু তাতে হাত উঠানোর কথা উল্লেখ নাই। মহা নবী (স.) জীবনে একবারও সমবেত সাহাবীদের নিয়ে ফরজ নামাজ শেষে হাত উঠিয়ে দু'আ করেছেন এমন প্রমাণ হাদীসের কেতাবে পাওয়া যায় না। তাই ধর্মীয় পন্ডিতেরা এই বিষয়টিকে বিদ'আত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) এর অভিমতও তাই। তিনি বলেন,

نَعَمْ اَلْاَدْعِيَةُ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ثَابِتَةٌ كَثِيْرًا بِلَا رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَبِدُوْنِ الْاِجْتِمَاعِ ۔ (العرف الشذى ، ٩٥)

অর্থাৎ হ্যাঁ, ফরজ নামাজের পর বহু দু'আ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সম্মিলিতভাবে হাত উঠানো ব্যতীত। (উরফুশ- শাজিঃ ৯৫ পৃ.)

এ ব্যাপারে মুফতি আব্দুল হাই লখনুবী (রহ.) ও ফাতওয়া প্রদান করেছেন। নিম্নে সেটি তুলে দেওয়া হলোঃ

این طریقة که فی زمانا مروج است امام بعد از سلام رفع یدین کرده دعاء میکنند و مقتدی آمین آمین می گویند رد زمانه که آه حضرت صلی الله علیه وسلم نبود چناچه ابن القیم در زادا المعاد تصریح کرد (مجموعة الفتاوی. ج۱. ۸۰)

অর্থাৎ বর্তমান সমাজে প্রচলিত যে প্রথা চালু আছে অর্থাৎ ইমাম সাহেব নামাজ শেষে সমবেত হয়ে হাত উঠায়ে দুয়া করে ও মুক্তাদীগর আমীন আমীন বলে, এটি মহানবী (স.) এর যুগে ছিল না। বিষয়টি ইবনে আব্দুল কাইয়ুম **যাদুল মাআদ**-এ পরিস্কার বর্ণনা করেছেন। (ফাতওয়ায়ে আব্দুল হাইঃ ১ম খন্ড, পৃ ১০০)

এ ব্যাপারে মুহাদ্দিস **হযরত ইউসূফ বিননূরী (রহ.) এর মতামতও** প্রানিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

قَدْ رَاجَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْبِلَادِ الدُّعَاءُ بِهَيْئَةٍ اِجْتِمَاعِيَّةٍ رَافِعِيْنَ أَيْدِيْهِمْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ لَمْ يَثْبُتْ ذٰلِكَ فِى عَهْدِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْاَخَصِّ بِالْمُوَاظِبَةِ نَعَمْ ثَبَتَتْ اَدْعِيَةٌ كَثِيْرَةٌ بِالتَّوَاتُرِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنَّهَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْاَيْدِىْ وَمِنْ غَيْرِ هَيْئَةٍ اِجْتِمَاعِيَّةٍ (معارف السنن، ج ٣، ٤٠٧)

অনেক স্থানে ফরজ নামাজ শেষে ইমাম-মোক্তাদী সকলে মিলে হাত উঠিয়ে দুয়া করার যে প্রথা চালু হয়েছে। বাস্তবে এ প্রথা রসূল (স.) এর যুগে ছিল না। আর সর্বদা করা তো আরো বেশি মারাত্মক। তবে হ্যাঁ, ফরজ নামাজের পর রসূলে করীম (স.) হতে অনেক দুআ পড়ার প্রমান আছে। (অর্থাৎ তিনি নামাজ শেষে এক এক সময় এক এক দুআ পাঠ করতেন) কিন্তু তা সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে নয়। (মায়ারিফুস সুনানঃ খন্ড ৩, পৃ. ৪০৭)

এ ব্যাপারে প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থ তিরমিজী শরীফের ব্যাখ্যাকার **হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী** (রহ)-এর বক্তব্যও প্রাণিধান যোগ্য। তিনি বলেনঃ

اِعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ يُوَاظِبُوْنَ عَلٰى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ بَعْدَ كُلِّ مَكْتُوْبَةٍ كَمُوَاظِبَةِ الْوَاجِبِ فَكَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ وَاجِبًا وَلِذٰلِكَ يُنْكِرُوْنَ عَلٰى مَنْ سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَدْعُ بِرَفْعِ يَدَيْهِ وَ صَنِيْعُهُمْ هٰذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اِمَامِهِمْ الْاِمَامُ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَ اَيْضًا مُخَالِفٌ لِمَا فِىْ كُتُبِهِمْ الْمُعْتَبِرَةِ. (تحفة الاحوذى شرح الترمذى، ج ٣، ٢٠٢)

জেনে রাখ, বর্তমানে হানাফী মাযহাবীগণ ফরজ নামাজের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করাকে যেভাবে ওয়াজিবের ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করে, মনে হয় এ সম্মিলিত মুনাজাতও একটি ওয়াজিব কাজ। এজন্যই যে সমস্ত লোকেরা ফরজ নামাজের সালাম ফিরায়ে শুধুমাত্র اللهم انت السلام। উক্ত দুয়াটি পাঠ করে হাত উঠানো ব্যতীত, তাদের সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তাদের এই নিয়ম (হাত উঠিয়ে দুআ করা) হযরত আবু হানিফা (রহ.) এর তরীকার পরিপন্থী এবং উক্ত মাযহাবের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থের বর্ণনারও পরিপন্থী। (তোহ্ফাতুল আহ্ ওয়াজী, ২য় খন্ড, পৃ. ২০২)

এ ব্যাপারে **হাফেজে হাদীস হযরত ইবনুল কাইয়ুম** বলেনঃ

اَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلٰوةِ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ أَوِ الْمَاْمُوْمِيْنَ فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ مِنْ هَدْيِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رُوِىَ عَنْهُ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَا حَسَنٍ. (زاد المعاد، ج ١، ص ٦٦)

আর ইমাম সাহেব সালাম ফিরায়ে পশ্চিমমুখী হয়ে অথবা মোক্তাদীগনের দিকে ফিরে (একত্রে) যে দুআ করে তা কখনো রসূলে করীম (স.) এর তরীকা নয়। এ সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ অথবা দূর্বল হাদীসও নেই। (যাদুল মায়াদঃ ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬)

শাইখুল হাদীস **আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রহ.)-এর মতও এখানে** উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ

اَمَّا دُعَاءُ الْاِمَامِ وَالْمَاْمُوْمِيْنَ جَمِيْعًا عَقِبَ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَنْقُلْ اَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الفتاوى الكبرى، ج ١، ص ١٥٨.

ইমাম এবং মোক্তাদী সম্মিলিত ভাবে ফরজ নামাজ শেষে যে মুনাজাত করে তা রসূলে করীম (স.) হতে কেউ বর্ণনা করেনি। (ফাতওয়ায়ে কুবরাঃ খন্ড ১প পৃ. ১৫৮)

আল্লামা শাতবী (রহ.) এ ব্যাপারে বলেনঃ

فَقَدْ حَصَلَ اِنَّ الدُّعَاءَ بِهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِ دَائِمًا لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا لَمْ يَكُنْ فِيْ قَوْلِهٖ وَ لَا اِقْرَارِهٖ، (الاعتصام، ج١، ص ٣٥٢)

শেষ কথা হলো, ফরজ নামাজের পর সর্বদা সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা রসূল (স.) হতে প্রমাণিত নয়। তিনি কখনো এরূপ বলেননি এবং সমর্থনও করেন নি। (আল এতেসামঃ খন্ড ১, পৃ ৩৫২)

আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মাক্কীও এ ব্যাপারটিকে রসূলের আদর্শ নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

إِذْ أَنَّهُ لَمْ يَرَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلٰوةً فَسَلَّمَ مِنْهَا وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَ دَعَا وَ أَمَّنَ الْمَأْمُوْمُ عَلٰى دُعَائِهِ وَكَذَالِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ بَعْدَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَكَذَالِكَ بَاقِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَشَيْئٌ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَلَا شَكَّ فِيْ أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهِ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ

(المدخل، ج ٢، ص ٣٨٣)

কখনো দেখা যায়নি যে, রসূলে করীম (স.) ফরজ নামাজের সালাম ফিরিয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করেছেন এবং মোক্তাদীরাও আমীন আমীন বলেছেন। চার খলিফা হতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ ভাবে সাহাবায়ে কেরামগণও করেছেন বলে প্রামণ নেই। যে কাজ রসূল (স.) এবং সাহাবীগণ করেননি সে কাজ করা হতে বিরত থাকা আবশ্যক। আর করা বিদআত। যেমন পূর্বে এধরণের আরো কিছু কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। (মাদখালঃ ২খন্ড, ২৮৩ পৃ.)

হাকীমুল উম্মত আল্লামা থানবী (রহ.) এর বক্তব্যও প্রাণিধান যোগ্য। তিনি বলেন,

وَقَدْ أَكْثَرُ النَّاسُ فِي هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ أَعْنِي دُعَاءُ الْإِمَامِ عَقِيبَ الصَّلٰوةِ وَتَامِيْنَ الْحَاضِرِيْنَ عَلٰى دُعَاءِهِ وَ حَاصِلُ مَا انْفَصَلَ عَنْهُ الْإِمَامُ ابْنُ عَرْفَةَ وَالْغَبْرِيْنِي أَنَّ ذٰلِكَ إِنْ كَانَ عَلٰى نِيَّةٍ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الصَّلٰوةِ وَ فَضَائِلِهَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (استحباب الدعوات ، ص ٨)

ফরজ নামাজ শেষে (হাত উঠিয়ে) ইমাম সাহেব দুআ করবেন এবং মোক্তাদীগণ আমীন আমীন বলবে, এসম্পর্কে ওলামায়ে কেরামগণ আলোচনা করেছেন। এর সমাধান হলো,. ইমাম আরাফা (রহ.) এবং গাবরাইনী (রহ.) যা বলেছেন। তা হলো যদি এই দুআকে নামাজের সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব মনে করা হয়, তবে তা করা জায়েজ নাই। (এস্তেহবাবুদ দাওয়াতঃ পৃ. ৮)

হযরত থানবী সাহেবের লেখার টীকাতে মুফতী ইউসূফ সাহেব (রহ) লিখেছেনঃ وَهٰذَا فِى زَمَانِنَا ثَابِتٌ بَلْ يَعْتَقِدُوْنَ ضَرُوْرِيَّاتِ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ فَلِهٰذَا يُنَازِعُ فِيْهِ অর্থাৎ ইবনে আরাফা ও গবরাইন যে কথা বলেছেন, তা বর্তমানে সমাজে পরিলক্ষিত। বরং তাকে জামাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেই মনে করে। তাই কোন ইমাম সাহেব মুনাজাত না করলে তাঁর প্রতি অশোভন বাক্য বর্ষণ করে। অনেক ক্ষেত্রে মুনাজাত না করলে ইমামতির সুযোগ হতে বঞ্চিত হতে হয়।

পাকিস্তানের বিখ্যাত **মুফতী আল্লামা শফী (রহ.)** এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

جیسا که آجکال عام مساجد مین امامون کا معمول هوگیا هے که کچه عربی زبان کے لکمات دعائیه انهین یاد هوتے هین ختم نماز پر انهین پڑھ دیتی هین اکثر تو خود ان امامون کو بهی ان کلمات کا مطلب و مفهوم معلوم نهین هوتا اور اگر انکو معلوم هوتو کم ازکم جاهل مقتدی تو اس سے بالکل بے خبر هوتے هین وه بے سمجهی امام کی پڑھے هوئے کلمات کی پیچهے آمین و آمین کهتے هین اس ساری تماشه کا حاصل چندکلمات کا پڑهنا هوتا هے دعا مانگنے کی جو حقیقت هی یهان پائی هی نهین جائے ، (معارف القرآن ،ج ، ۳ ، ۳۲۷)

آخر بات رسول کریم صلی الله علیه وسلم اور صحابة اور تابعین اور ائمة دین مین سی کسی سی یه ضرورت منقول نهین که نمازون کی بعد وه دعاء کریں اور مقتدی صرف آمین آمین کهتے رهین ، خصلاصة یه هے کہ یہ طریقۂ مروجه قرآن کی بتلائی هوئ طریقۂ دعا سے بهی خلاف هے اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم اور صحابة کرام کی سنت کی بهی خلاف هي(احکام الدعاء، ص ۱۳)

বর্তমানে অনেক মসজিদে ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, কিছু আরবি দুআ তারা মুখস্থ করে নামাজ শেষে (হাত উঠায়ে) তা পড়তে থাকে। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, পঠিত সেই দুআগুলির সারমর্ম (এমন কি অর্থও) তাদের জানা নেই। আবার ইমামগণের যদিও তা জনা থাকে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, অধিকাংশ মোক্তাদীই তার অর্থ বোঝে না। এমনটি হলো কিছু দুআ মুখে আওড়ান। বাস্তবে এটি দুআর বাস্তব রূপ নয়। (মায়ারেফুল কুরআনঃ খন্ড ৩, পৃ ৫৭৭)

শেষ কথা হলো, রসূলে করীম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন এবং শরীয়তের চার মাযহাবের ইমামগণ ফরজ নামাজের পরে এ ধরণের মুনাজাত করেছেন বলে কোন প্রমান নাই। তাই এই প্রথা কুরআন-হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামগণের আদর্শের পরিপন্থী। (আহকামে দুআঃ পৃ. ১৩)

বাংলাদেশের শিরোমণি মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) এর ফতোয়া নিম্নরূপঃ

فرائض کی بعد دعا کی چار صورتیں ہیں:

اول: یہ کہ اکیلا ہاتھ اٹھائے بغیروہ ادعیہ زبانی پڑھنا جو احادیث میں وارد ہوئ ہیں، ایسی دعا بلا شك صحیح روایتوں سے ثابت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بلا رفع یدین ایسی دعائي پڑھا کرتی تھی،

دوم: یہ کی کبھی کبھی انفرادًا ہاتھ اٹھا کر الفاظ دعا پڑھنا ایسی دعا کسی بھی صحیح روایتون سی ثابت نہیں ہے. البتة بعض ضعیف قسم کی فعلی حدیثون سے ثابت ہے،

سوم: یہ کی امام و مقتدی سب ملکر ہاتھ اٹھا کر ہیئت اجتماعیة کی ساتھ کبھی کبھی دعا کرنا ایسی دعا بھی نا احادیث سی خواہ صحیح ہوں یا ضعیف یا موضوع ثابت ہی نکہ کوئ بزرگ کی عمل سے ثابت ہئ،

چہارم: بعد فرائض ہمیشة سب اکٹھی ملکر جماعت کی شکل میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شریعت غرامین ایسی

دعا کا اصلًا و قطعًا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تعامل سلف س نہ احادیث سی خواہ وہ صحیح ہو، یا ضعیف یا موضوع اور نہ کسی فقہ کی عبارۃ سے یہ دعا یقینا بدعت ہی (احکام الدعوات المروجہ، ص۲۱)

ফরজ নামাজের পর দুআর চারটি নিয়ম আছে। যথা-

ক. মাঝে মাঝে একা একা হাত উঠান ব্যতীত হাদীসে উল্লিখিত দুআ পাঠ করা। এটি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রসূল (স.) কখনো কখনো হাত উঠান ব্যতীত দুআ পাঠ করতেন। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ (স.) সালাম ফেরানোর পর তিনবার استغفر الله। পাঠ করে اللهم انت السلام ومنك السلام الخ।পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে হাদীসে অন্যান্য দুআর কথাও উল্লেখ আছে যা তিনি এক এক সময় এক একটি পাঠ করতেন। কাজেই এ ভাবে নামাজ শেষে দুআ পাঠ করা নবীর আদর্শ।

খ. মাঝে মাঝে একা একা হাত উঠিয়ে দুআ করা। এটি বিশুদ্ধ কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ, কোন কোন দুর্বল সনদের কিছু হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এটিও জায়েজ।

গ. মাঝে মাঝে ইমাম ও মোক্তাদী মিলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ তথা মুনাজাত করা। এটি বিশুদ্ধ কোন হাদীস দ্বারা তো নয়, দুর্বল সনদের কোন হাদীসও এর সপক্ষে পেশ করা সম্ভব নয়।

ঘ. ইমাম ও মোক্তাদীমিলে সম্মিলিতভাবে দুহাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে সর্বদা মুনাজাত করা। এটিও তৃতীয় প্রকারের ন্যায় প্রমাণহীন। বরং নিঃসন্দেহে এটি বিদআত। (আহকামে দুআঃ ২১ পৃ)

প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে মুফতী রশিদ আহমেদ (রহ.) এর মতামত তিনি বলেন,

হুজুরে আকরাম (স.) প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ ৫ বার প্রকাশ্যভাবে জামাতের সাথে আদায় করেছেন। তিনি যদি একবারও নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করতেন, তা হলে নিশ্চয় একজন না একজন সাহাবী হতে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। অথচ অসংখ্য হাদীসের মধ্যে তেমন একটি হাদীসও খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপরও যদি কিছুক্ষণের জন্য এটিকে মুস্তাহাব ধরে নেওয়া হয়, তবুও বর্তমানে এটিকে যেরূপ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বিদআত। (আহকামুল ফাতওয়াঃ খন্ড ৩, পৃ. ৬৮)

ঢাকা কেন্দ্রীয় ইফ্‌তা বোর্ড বসুন্ধরা থকে প্রকাশিত ফাতওয়াও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ফাতওয়াতে উল্লেখ করা হয় যে, ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার পর মোনাজাতকে সর্বদা আঁকড়ে ধরা অত্যাবশ্যক মনে করা হয় এবং কোন ইমাম সাহেব মুনাজাত না করলে তার সমালোচনা করা হয়। তা হলে এমতাবস্থায় মোস্তাহাব কাজও পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই যেখানে সম্মিলিত দুআকে অত্যাবশ্যক করে নেয়া হয়েছে সেখানে মোনাজাত করা থেকে বাধা প্রদান করা আবশ্যক। (ফাতওয়া নম্বরঃ ৯৬৫)

উত্তর সঠিক	উত্তর সঠিক	উত্তর সঠিক
মুফঃ আঃ রহমান	মুফঃ নুরুল হক	মুফঃ জামাল উদ্দীন

* *

দু'আর প্রকার

প্রকৃতপক্ষে দু'আ দুই প্রকার। এক. দু'আ মাছুরা দুই. দু'আয়ে মাসউলাহ। দু'আ মাছুরা ঐ দু'আকে বলা হয়, যা রসূলে করীম (স). বিভিন্ন স্থানে পাঠ করার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন মসজিদে প্রবেশের দু'আ, বাহির হবার দু'আ, আহার ভক্ষণের আগের ও পরের দু'আ। এইভাবে নামাজ শেষ করার পরের দু'আ ইত্যাদি।এই দু'আগুলির অর্থ যদিও প্রার্থনার অনুরূপ, প্রকৃত অর্থে এগুলো পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো জিকর করা, ঠিক জুমার খুতবা ও আজানের ন্যায়। তাই এ সমস্ত দুআর শুধুমাত্র বাংলা অর্থ বললে সুন্নত আদায় হবে না। তবে দুয়া করা হয়ে যাবে। আর দুআ পাঠের সাথে সাথে অর্থও বোধগম্য হওয়া অধিক ভালো কাজ। অন্যদিকে কেউ যদি অর্থ না বুঝে শুধু দুআগুলো বিশুদ্ধ আরবিতে পাঠ করে তবে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু দু'আ মাছুরার ক্ষেত্রে কোন দু'আতে কোন শব্দ রসুলুল্লাহ থেকে এবং কোন অবস্থায় পড়া হয়েছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কি হাত উত্তোলন করেছেন কিনা তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন হযরত বশির (রাঃ) খোতবার দু'আতে হাত উত্তোলন করেছিলেন বলে হযরত আম্মার (রাঃ) তার জন্য মন্দ দু'আ করেছিলেন। এজন্য মুহাক্কেকীনগণ বলেন, যে দুআ পাঠের সময় রসূল (স.) হাত উঠান নি সে সমস্ত দু'আ পাঠের সময় হাত উঠান মাকরুহ। অনুরূপভাবে দু'আর অভ্যন্তরে একই অর্থবোধক অন্য শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না এবং বাড়ানো-কমানো

যাবে না।। যেমন ইবনে ওমর জনৈক ব্যক্তিকে হাঁচি দিয়ে الحمد لله। বলার পর والسلام على رسول الله বলার সময় বাধা প্রদান করেছেন।

অন্যদিকে হযরত তাহাবী ও মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) বলেন, ফরজ নামাজ শেষে তিনবার এস্তেগফার পাঠের পর اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام পাঠ করা নবীর আদর্শ। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন ইমামগণ وَمِنْكَ السَّلَامُ এর পর وَحَيِّنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ বাড়িয়ে বলে থাকেন। অথচ হাদীসে ও ধরণের শব্দ ব্যবহারের কোন প্রমান নেই।
(মিরকাতঃ খন্ড২, পৃষ্ঠা ৩৫৮)

দুটি দু'আর ২য় নম্বর দু'আ হলো মাসউলাহ। অর্থাৎ রসূলে করীম (স.) কর্তৃক নির্ধারিত দু'আ ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলে পাঠ করা। এই ধরণের দু'আ পাঠের নিয়ম হলো, প্রথমে দু রাকা'আত সালাতুল হাজত এর নামাজ আদায় করার পর সম্ভব হলে কিছু অর্থসম্পদ দান করে দুআর আগে ও পরে দরুদ পাঠ করা এবং অনুতপ্তের সাথে অশ্রুসজল নেত্রে আল্লাহর কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এরূপ দু'আ করার ক্ষেত্রেও দুহাত উত্তোলন করা দু'আর শিষ্ঠাচারের অন্তর্ভূক্ত। তবে এইরূপ দু'আর ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নিমন্ত্রণ জানান মাকরুহ। (ফাতহুল ক্বাদীর) বরং এরূপ দু'আ একা একা নীরবে করাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশে এরূপ দু'আ করার জন্য এক ধরণের প্রথার প্রচলন ঘটেছে। তা হলো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরকে দাওয়াত দিয়ে তাদের জন্য ভাল আহারের ব্যবস্হা করা। আর দু'আর মাহফিল শেষে হাদীয়ার নামে অর্থ-কড়ি প্রদান করা। মনে রাখতে হবে এটি ইহুদি ও খৃষ্টানদের প্রথা। তারা সাধারণ মানুষকে ধোকা দেবার জন্য বলতো, তোমরা সর্বদা দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত। তাই তোমরা আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দাও। আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনায় দুআ করবো, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে। অবশ্য দ্বীনদার আলেমের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং যথাসাধ্য তাঁর খিদমত করা ভালো কাজ। কিন্তু তা উল্লিখিত পন্থায় নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই জামানার মানুষগণকে সাবধান করার জন্য কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই প্রথার নিন্দা করেছেন। সূরা ফাতেহার শেষ দু আয়াত মূলত এই জন্যই। শেষ কথা হলো বান্দার আল্লাহর সাথে যোগাযোগের জন্য কোন ভাষা বা সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। বরং সব শ্রেণীর মানুষই

আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে দু‘আর শিষ্টাচার রক্ষা করে নিজের মাতৃভাষাতে দু‘আ করতে পারে এবং সেটিই উত্তম। কেননা তাতে মনের আবেগ পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়।

শেষ সিদ্ধান্তঃ

ফরজ নামাজ শেষে বর্তমানে প্রচলিত যে নিয়মে দু‘আ করা হয় তা বিদ‘আত। কারণ এ মুনাজাতকে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও জরুরী মনে করা হচ্ছে। ফলে কোন ইমাম সাহেব মুনাজাত না করলে তাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে কোন ব্যক্তি যদি কোন মুস্তাহাব আমলকে ওয়াজিবের ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করে, তবে তা কবীরা গুনাহের পর্যায়ে পড়বে। (মিরকাত)

অন্যদিকে ইমাম সাহেব বিষয়টি জানলেও তার উপর আমল করতে সক্ষম হচ্ছেন না। কারণ মুক্তাদীদের মধ্যে মুনাজাত করা আবশ্যক এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে তাদের মগজে বসে আছে। ফলে ইমাম সাহেব মাঝে মধ্যেও দু‘আ করা ছেড়ে দিতে পারছেন না। হচ্ছেন সমালোচিত। বিষয়টিকে মুক্তাদীরা এতো গুরুত্ব মনে করেন যে, অনেক ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের চাকুরীটি পর্যন্ত হারাতে হচ্ছে। কাজেই কোন ইমামের পক্ষে এরূপ মুনাজাত করা জায়েজ নয়। বরং তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। তাই তাদের কর্তব্য মোক্তাদীদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা। মুনাজাত যে নামাজের কোন অঙ্গ নয় এবং এটি মুস্তাহাব পর্যায়েরও কোন বিষয় না তা বুঝাতে স[illegible] হতে হবে।
অনেকে আবার ব[illegible] বর্তমানে বিষয়টি এতো মজবুতভাবে মানুষের মধ্যে বসে আছে তা দূর ক[illegible] গেলে ফেতনাত সৃষ্টি হবে। কিন্তু সত্যি কথা হলো বিষয়টি বাস্তবে তেমন নয়। প্রথম কথা হাদীস-কুরআনের আলোকে তাদেরকে সঠিক বিষয়টি বুঝাতে হবে। তারপর পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া যে ফেতনার কথা বলা হচ্ছে, তা মূলত শরীয়তের দৃষ্টিতে ফিতনা নয়। শরীয়াতের ফিতনা অন্য বিষয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় الفتنة اشد من القتل ، الفتنة اكبر من القتل।
(সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যা হতে মারত্মক/ সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা বড় অপরাধ) এই ফেতনা বলতে শিরক, বিদআত, হত্যা, লুণ্ঠন, আরাজকতা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচারণ করে দাঙ্গা বাধান ইত্যাদিকে বুঝান হয়েছে। কাজেই এসবকে দুর করতে হলে প্রয়োজন বোধে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হলেও তা দূর করতে হবে। (মাআরেফুল কুরআন)

দু'আতে হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে আলোচনা

দু'আ করার সময় যেসব স্থানে মহানবী (স.) হাত উত্তোলন করেননি সেসব স্থানে হাত উঠান অনুচিত। যেমন হযরত হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ وَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيْنِ الْقُصَيِّرَتَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَ اَشَارَ هُشَيْمُ بِالسَّبَّابَةِ (رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح)

আমি উমারাহ ইবনে রুবাইবাহ (কুফার অধিসাসী এক সাহাবী) এবং বিশর ইবনে মারওয়ান (কুফার আমীর) সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, একদা তিনি (কুফার জামে মসজিদে) খুতবা পাঠ করা অবস্থায় দু'আর সময় হাত উঠালে উমাইরা (রা.) বলে উঠলেন, আল্লাহ এ তুচ্ছ হাতদুটিকে বরবাদ করুন। আবশ্যই আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে (খুতবা পড়তে) দেখেছি। তাকে (খোতবার মধ্যে দু'আর সময়) আঙ্গুলের এশারা ছাড়া হাত উঠাতে দেখিনি। (তিরমিজীঃ খন্ড ১ম, পৃ ১৪৪)

হাদীসের মূল কথা হলো যেখানে দু'আর সময় স্বয়ং রসূল (স.) হাত উত্তোলন করেন নি, সেখানে আমাদের জন্য ' হাত উঠানো কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। বরং দু'আর সময় হাত উঠানোকে শরীয়তের বিধান মনে করা বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে আহারের শুরু এবং শেষে, পায়খানা-প্রস্রাবের পূর্বে ও পরে, মসজিদে প্রবেশ ও বের হবার সময় দু'আ পাঠের প্রমাণ হুজুর (স.) থেকে আছে। কিন্তু হাত উঠানোর প্রমাণ নেই।

কাজেই বুঝা গেল যে, যে সকল ক্ষেত্রে দু'আ পাঠের সময় স্বয়ং রসূল (স.) হাত উত্তোলন করেননি এবং চেহারায় হাত লাগাননি, সে সব ক্ষেত্রে হাত উত্তোলন করা এবং চেহারায় হাত লাগান শরীয়তের কোন নির্দেশ বা নিয়ম হতে পারে না। যেমন কাবা প্রদক্ষিণ করার সময়, পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায়ের সময়, ঘুম থেকে উঠা এবং ঘুমানোর সময় ইত্যাদি। কাজেই এ থেকে দূরে থাকা বাঞ্চনীয়। কেননা, সলফে সালেহীন এবং আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীনগণের থেকে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঈদের নামাজে হাত উঠিয়ে দুআ করা সম্পর্কেঃ

ঈদের নামাজের পর অথবা খুতবা পাঠের পর কি করণীয় সে সম্পর্কে ইমামুল মুহাক্কিকীন আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষনুবী (রহ.) বলেন,

> হাদীসের কিতাবসমুহ হতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হুজুর (স.) খুতবা শেষে ঈদগাহ হতে চলে যেতেন। নামাজের পর অথবা খুতবার পর তিনি দুআ করেছেন এরূপ প্রমাণ নেই। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ী হতেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (মাজমুয়া ফাতওয়াঃ ১/১২০)

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) বলেন,

> হযরত উম্মে আতিয়্যা (র.) এর বাণী, তিনি বলেন যে, আমাদের কে হুকুম করা হয়েছিল মাসিক অবস্থায় ঈদগাহে যেতে যাতে পুরুষদের সাথে তাকবীর পাঠে ও দুআর অনুষ্ঠানে শরীক হতে পারি।

এ হাদীস থেকে এটি বুঝা ঠিক হবে না যে, ঈদের নামাজের পরও দুআ হতো। এসম্পর্কে নামাজের পরে দুআ করার ব্যাপারে রূপক হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা ঠিক হবে না। কেননা, রসূল (স.) তাঁর পবিত্র জীবনে আঠারটি ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু তিনি নামাজের পরে দুআ করেছেন সংক্রান্ত কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং ব্যাপক ভিত্তিক নামাজের পরে দুআ পাঠের যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা ঈদের নামাজের পরে দুআ প্রমাণিত হয় না।

অন্যদিকে ঈদের নামাজ এবং খুতবার মধ্যে বিলম্ব করা অনুচিত। তাতে উভয়ের মধ্যে পৃথকতা এসে যায়। কাজেই এই সময়ে দুআ করা ঠিক নয়। আর হাদীসের মধ্যে যে জিকর ও দুআর কথা এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খুতবার মধ্যে যে সব দুআ থাকে, তাই। (ফয়জুল বারীঃ খন্ড ২, পৃ. ৩৬২ও আরফুস সাজীঃ ২৪১; আনওয়ারুল বারী শরহে বুখারীঃ খন্ড ৮, পৃ ৯৮-৯১, উর্দু)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমাম মাওলানা আব্দুশ শুকুর (রহ.) বলেনঃ

> ঈদের নামাজের পরে দুআ করা নবী করীম (স), সাহাবী , তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীদের থেকে প্রমাণিত হয়নি। যদি তাঁরা করতেন তবে তা অবশ্যই বর্ণিত হতো। কাজহে এমন কাজ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। (ইলমুল ফিক্হাঃ ২/১৭১)

তবে মুফতী কেফায়তুল্লাহ (রহ.) বলেন, দুআ করলে অসুবিধা নাই। (কেফায়াতুল মুফতীঃ খন্ড ৩, ২৫১পৃ.)

হাকীমুল উম্মত মাও. আশরাফ আলী থানবী বলেন, ঈদের নামাজ ও খুতাবন্ধ পর বিশেষভাবে দুআ করার ব্যাপারে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং কেহ যদি করতে চায় করতে পারে। আর কেহ যদি না করে তাও তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু তাকে তিরস্কার করা যাবে না।

ফাতওয়ায়ে রহিমিয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ ঈদের নামাজ এবং খুতবার শেষে সুন্নত ধারণা করে দুআ করে তবে তা সুন্নতের পরিপন্থী এবং মাকরুহ হবে। (ফাতওয়ায়ে রহিমিয়াঃ খন্ড ৫, পৃ. ৮১-৮২)

বর্তমান যুগে এ ধরণের দু'আ করা অনেকটা অত্যাবশ্যক রূপে প্রচলিত হয়েছে, এমনকি সাধারণ মানুষ এটিকে নামাজের অংশ মনে করে। তাই ধর্মীয় পন্ডিতদের উচিৎ এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে তাদের ভ্রান্ত ধারনার অবসান ঘটান। কেননা, কোন মুস্তাহাব কাজকে যদি সুন্নাত বা ওয়াজিবের ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়, তবে সে কাজ পরিহার করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

****

নফল ইবাদতের জন্য একত্রিত হওয়া

শরীয়ত পরিপন্থী নিয়মে কোন ইতাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় নয়। সাধারণত সুন্নাত ও নফল নামাজ (যেমন ইশরাকের নামাজ, আউয়াবীনের নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ) জামায়াতের সাথে আদায়ের বিধান শরীয়তে নেই। তাই এসব নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করা হতে বিরত থাকতে হবে। বরং এরূপ করা বিদআতের অন্তর্ভূক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এ ব্যাপারে বুখারী শরীফে মুজাহেদ হতে বর্ণিত হয়েছেঃ

دَخَلْتُ اَنَا وَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ عَلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَاِذَا اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِى الْمَسْجِدِ صَلٰوةَ الضُّحٰى قَالَ فَسَئَلْنَاهُ عَنْ صَلٰوتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ (

بخارى ، ج ١ ، ص ٢٣٨)

আমি এবং উরওয়া ইবনে জুবাইর মসজিদে প্রবেশ করে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর(রা.) হযরত আয়েশা (রা.) এর হুজরার নিকট বসা অবস্থায় দেখতে পাই। সে সময় কিছু মানুষ মসজিদে চাশতের সালাত আদায় করছিল। (মুজাহেদ বলেন) আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কে তাদের সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, এসব বিদআত। (বুখারী শরীফঃ খন্ড. ১, ২৩৮পৃ.)

অনুরূপ ভাবে বাহরুর রায়েক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

وَمِنَ الْمَنْدُوبَاتِ اِحْيَاءُ لَيَالِى الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَتَى الْعِيْدَيْنِ وَلَيَالِىْ عَشْرِ ذِىْ الْحَجَّةِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْاَحَادِيْثُ وَذَكَرَهَا فِى التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ مُفَصَّلَةً وَالْمُرَادُ بِاِحْيَاءِ اللَّيْلِ قِيَامُهُ. وَيُكْرَهُ الْاِجْتِمَاعُ عَلَى اِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هٰذِهِ اللَّيَالِىْ فِى الْمَسَاجِدِ. (البحر الرائق. ج ٢. ص ٥٢. باب الوتر والنوافل)

রমাজন মাসের শেষ দশদিনের রাত, ঈদের দু রাত, জিল হজ মাসের ১ম তারিখ হতে ১০ তারিখের রাত এবং শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত জাগরণ করা মুস্হাবের অন্তর্ভূক্ত। হাদীসের কিতাবে এর ফযিলাত সম্পর্কে তারগীব ও তারহীব অধ্যায়ে বিশদ বর্ণিত হয়েছে। আর রাত্র জাগরণ অর্থ সালাত আদায় করা।

কিন্তু এ সমস্ত সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে জামায়েত হওয়া মাকরুহ। অনুরূপভাবে দরূদ পাঠ ভাল কাজ হলেও সমবেত হয়ে সুরে সূর মিলিয়ে পাঠ করা অনুচিত। মাজালেসুল আবরার গ্রন্থ প্রণেতা এ ব্যাপারে বলেন,

وَيَسْتَحِبُّ التَّكْبِيْرُ فِى طَرِيْقِ الْمُصَلّٰى --- لٰكِنْ لَا عَلٰى هَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِ وَالْاِتِّفَاقِ فِى الصَّوْتِ وَ مُرَاعَاةِ الْاِنْغَامِ فَاِنَّ ذٰلِكَ كُلَّهُ حَرَامٌ بَلْ يُكَبِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ (مجالس الابرار. ٢٣١-٢٣٢)

ঈদগাহে যেতে-আসতে তাকবীর পাঠ (اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ) মুস্তাহাব। কিন্তু সবাই একত্রিত হয়ে উচ্চ স্বরে সুর মিলিয়ে পড়বে না, কারণ তা হারাম। বরং একা একা পাঠ করবে। (মাজালেসুল আবরারঃ ২৩১-২৩২; ফাতওয়ায়ে রহীমিয়াঃ ৪৩০-৪৪১)

কাজেই উল্লিখিত বিষয় যেহেতু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই তা শরীয়াতের বিধান ভেবে করা বিদআতঃ (ইমদাদুল মুফতীয়ীনঃ খন্ড ২, পৃ. ১৯৫)

০০০০

নফল নামাজ জামায়াতে আদায়

তারাবীহ, ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য নামাজ) এবং কুসূফ (সূর্য গ্রহণের সময় নামাজ) এর নামাজ ব্যতীত অন্য যে কোন নফল নামাজ অন্যকে আহবান করে জামায়াতের সাথে আদায় করা মাকরুহ তাহরীমী। এমনকি তা রমজান মাসের নফল নামাজ হলেও। এই কথার উপর ইসালমী আইনবিদ, হাদীস বিশারদগণ সহ সলফে সালেহীনগণ সকলেই একমত।

বাদায়ে উস্-সনায়ে কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

إِذَا صَلَّوا التَّرَاوِيحَ ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يُّصَلُّوهَا ثَانِيًا يُصَلُّوْنَ فُرَادٰى لَا لِجَمَاعَةٍ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ وَالتَّطَوُّعُ الْمُطْلَقُ بِجَمَاعَةٍ مَكْرُوْهٌ (بدائع ، ج ١ ، ٢٩٠)

মানুষেরা যদি তারাবীহের নামাজ একবার আদায় করে পুণরায় আদায় করতে চায়, তবে একা একা আদায় করবে, জামায়াতের সাথে নয়। কেননা দ্বিতীয়বার আদায় হবে নফল। আর নফল নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করা মাকরুহ।

(বাদায়েউস সানায়েঃ খন্ড ১, পৃ. ২৯০)

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে নুজায়ীম (রহ.) বলেনঃ

وَلَوْ صَلُّوا بِجَمَاعَةٍ ثُمَّ أَرَادُوا إِعَادَتَهَا بِالْجَمَاعَةِ يُكْرَهُ لِأَنَّ النَّفْلَ بِجَمَاعَةٍ عَلَى التَّدَاعِيْ يُكْرَهُ إِلَّا بِالنَّصِّ. (بزازية على هامش الهندية ، ج ٤ ، ص ٣١)

জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করার পর তারা যদি পুণরায় তা জামায়াতের সাথে আদায় করতে চায়, তবে তা মাকরুহ হবে। কেননা, একে অন্যকে আহবান করে শরীয়তের নির্দেশ ছাড়া নফল নামাজ জামায়াতে আদায় করা মাকরুহ।

(বাজ্জাযিয়া)

উপরোক্ত আলোচনা হতে জানা গেল যে, তারাবীহের নামাজ একবার জামায়াতের সাথে আদায়ের পর পুণরায় জামায়াতের সাথে আদায় করা মাকরুহ। কেননা ২য় বার আদায় করা নফল। আর নফল নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করা মাকরুহ। কাজেই রমজান মাসে হোক অথবা অন্য সময়ে হোক নফল নামাজ একে অন্যকে আহবান করে জায়াতের সাথে আদায় করা মাকরুহে তাহ্রিমী।

আল্লামা তাহের ইবনে আব্দুর রশিদ বুখারী (রহ.) খোলাসাতুল ফাতওয়াতে লিখেছেনঃ

وَلَوْ زَادَ عَلٰى الْعِشْرِيْنَ بِالْجَمَاعَةِ يُكْرَهُ عِنْدَنَا بِنَاءً عَلٰى اَنَّ صَلٰوةِ التَّطَوُّعِ بِالْجَمَاعَةِ مَكْرُوْهٌ (خلاصة الفتاوى. ج١، ص ٦٣)

যদি কেহ রমজানের তারাবীহের নামাজ ২০ রাকায়াতের পরে অধিক জামায়াতের সাথে আদায় করে তবে, তা আমাদের নিকট মাকরুহ হবে। কেননা, শুধু নফল নামাজ জামায়াতে আদায় করা মাকরুহ। (খোলাসাতুল ফাতওয়াঃ ১খন্ড, পৃ. ৬৩)

যদি রমজান মাসে নফল নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করা জায়েজ হতো তবে বিশ রাকায়াত তারাবীহের পর অতিরিক্ত নামাজ আদায়ও জায়েজ হতো। এব্যাপারে আল্লামা শামী বলেনঃ

وَ لَا يُصَلِّى الْوِتْرَ وَلَا التَّطَوُّعَ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمْضَانَ اَىْ يُكْرَهُ ذٰلِكَ لَوْ عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَاعِىْ بِاَنْ يَّقْتَدِىْ اَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ كَمَا فِى الدُّرَرِ، (شامى، ج ١، ص ٦٦٣)

বিতর এবং অন্য কোন নফল নামাজ রমজান ব্যতীত জামায়াতের সাথে একে অন্যকে আহবান করে আদায় করা যাবে না তাদায়ীর সাথে, করলে মাকরুহ হবে। যেমন এক ইমামের পিছনে চার ব্যক্তির ইকতেদা করা। (ফাতওয়ায়ে শামীঃ ১/৬৬৩)

এ ব্যাপারে আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন,

اَلْجَمَاعَةُ فِىْ التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ اِلَّا فِىْ قِيَامِ رَمْضَانَ وَفِى الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ اَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (بدائع الصنائع، ج١، ٢٩٨)

তারাবীহের নামাজ ব্যতীত নফল নামাজে জামায়াত সুন্নত নয়। আর ফরজ নামাজ জামায়াতে আদায় করা ওয়াজিব অথবা সুন্নত। (বাদায়েউস সানায়েঃ ১/২৯৮)

মুহাক্কিক ইবনে হুমামের মতামতও এখানে উল্লেখযোগ্যঃ

وَقَدْ صَرَّحَ الْحَاكِمُ اَيْضًا فِى بَابِ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ مِنَ الْكَافِىْ بِقَوْلِهٖ وَيُكْرَهُ صَلٰوةُ التَّطَوُّعِ جَمَاعَةً مَا خَلَا قِيَامِ رَمْضَانَ وَصَلٰوةِ الْكُسُوْفِ(فتح القدير ج، ٢، ص ٤٣٨)

কাফি নামক গ্রন্থের সূর্য গ্রহণের সময় নামাজ আদায়-এর অধ্যায়ে হাকেম বর্ণনা করেন, কিয়ামে রমাজানও সালাতে কুসূফ ব্যতীত অন্য কোন নফল নামাজ

জামায়াতের সাথে আদায় করা মাকরুহ। উল্লিখিত প্রমাণসমূহে নফল নামাজ জামায়াতে আদায় করা মাকরুহ হওয়া থেকে কিয়ামে রমজানকে পৃথক করা হয়েছে। (এখানে তারাবীহ এর স্হলে কিয়ামে রমজান বলা হয়েছে। এর ব্যাপকতা থেকে সন্দেহ হতে পারে যে, এই হুকুম শুধু রমজান ব্যতীত অন্য সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বাস্তবে কিয়ামে রমজানের দ্বারা ফুকাহায়ে কিরামের নিকট তারাবীহের নামাজই উদ্দেশ্য।

এ ছাড়াও সাধারণ যুক্তিতে রমজান মাসে নফল নামাজ জামায়াতের সাথে না হওয়াই বঞ্চনীয়। কেননা, তারাবীহের নামাজ ফরজ না হওয়া সত্তেও জামায়াতের সাথে আদায় করা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে শরীয়তের প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। কেননা নফল নামাজ যে শুধুমাত্র জামায়াতের সাথে হবে না তাই নয় বরং ঘরে-বসে আদায় করা উত্তম। যেমন একটি হাদীসে এসেছেঃ

صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِى مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ

ফরজ নামাজ ব্যতীত কারো জন্য নফল নামাজ আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) আদায় করা হতে ঘরে আদায় করা উত্তম ।

কাজেই প্রমাণিত হলো যে, তারাবীহের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করা নিয়মের ব্যতিক্রম ছাড়া শরীয়তের প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই এর উপর ভিত্তি করে অন্য বিষয়কে নির্দিষ্ট করা যায় না। তাই তারাবীহে জামায়াতের উপর ভিত্তি করে অন্য নফল নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করার ঘোষণা দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। যেমন তাহাজ্জুদ, আউয়াবীন, ইত্যাদি।

হযরত শায়েখ আহমেদ রুমী (রহ.) মাজালিসুল আবরার নামক কিতাবের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইসলামী আইন বিশারদগণ এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, নফল নামাজে যদি ইমাম ব্যতীত চারজন মোক্তাদী হয় তবে জামায়াতের সাথে আদায় করা মাকরুহ হবে। আর যদি এক জন অথবা দুজন হয় তবে মাকরুহ হবে না। আর যদি মুক্তাদী তিনজন হয় তবে মাকরুহ হওয়া না হওয়ার মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান।

এ ব্যাপারে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এর মতামতের দিকেও দৃষ্টি ফেরান যেতে পারে। তিনি ফাতওয়ায়ে রশিদিয়ার ৩৮৭ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেনঃ

اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم تهجد كو هميشة منفردا پڑهتى تهى. كبهى بهى تداعى جماعت نهين فرمائى. اگر كوئ شخص آكرملا هوا تو مضائقة نهين.

جیسا کہ حضرت بن عباس رضی اللہ خود ایك دفعہ أب

کے پیچھی جاکھڑ ی ہو ئ تھی بخلاف تراویح کی کہ

اس کو چند بار تداعی کی ساتھ جماعت کرکے ادا ء کیا ،

فتاوی رشیدیة ، ۳۰۸

রসূলে করীম সর্বদা তাহাজ্জুদের নামাজ একা আদায় করেছেন, মানুষকে ডেকে এক সাথে পড়েননি। যদি একা আদায় করা অবস্থায় কোন ব্যক্তি পাশে এসে দাঁড়ায় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস হুজুর (স.) এর পিছে তাহাজ্জুদ নামাজের ইক্‌তেদা করেছেন। তবে তারাবীহের নামাজ এর ব্যতিক্রম। কেননা তিনি কয়েকবার সাহাবীদেরকে ডেকে জামায়াতের সাথে আদায় করেছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মুফতী তকী ওসমানী (রহ.) এর ফেক্‌হী মাকালাতের ২য় খন্ডের ৩৫ হতে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

ooo

আজানের সময় আঙ্গুল চুম্বন

আভিধানিক অর্থে যে কোন আহবানকে আজান বলা হয়। তবে শরীয়তের পরিভাষায় জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য মুসলমানদেরকে একত্রিত করার নিমিত্তে যে নির্দিষ্ট শব্দ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে আজান বলে। একজন আহবানকারী (মুয়াজ্জিন) সুললীত কণ্ঠে আল্লাহ ও তার রসূলের নাম সম্বলিত বাক্য দ্বারা মুসল্লীদেরকে আহবান করেন। এই আজানেও রয়েছে শরীয়তের নির্ধারিত নির্দেশ। আজানে ব্যবহৃত শব্দ এবং আজানের পরে ব্যবহৃত দুআ এবং আজান সম্পর্কে বিধানাবলী হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান। তবে আজানের সময় আঙুলে চুম্বন করার নির্দেশ কোন দূর্বল হাদীসেও উল্লেখ নেই। অথচ এই নিয়মটি আজ আনেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত তাফসীর কারক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূ্যতি তাঁর **তাইসিরুল মাকাল** নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

اَلْاَحَادِیْثُ الَّتِیْ رُوِیَتْ فِیْ تَقْبِیْلِ الْاَنَامِلِ وَ جَعْلُهَا عَلَی الْعَیْنَیْنِ عِنْدَ سِمَاعِ اِسْمِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ فِیْ کَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مَوْضُوْعَاتٌ انتهی

মুয়াজ্জিনের শাহাদাত বাক্য পাঠের সময় আঙুল চুম্বন করে চোখে স্পর্শ করার ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সব বানোয়াট জাল হাদীস।
এ ব্যাপারে আল্লামা তাহের হানাফী (রহ) বলেনঃ
وَلَا يَصِحُّ تَذْكِرَةُ الْمَوْضُوْعَاتِ বানোয়াট জাল হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়।

মোল্লা আলী কারী হানাফি (রহ) এ ব্যাপারে আল্লামা সাখাবী (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, لا يصح الروايات (এসব বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়)। কাজেই বর্ণনাগুলো যখন শুদ্ধ নয়, তখন তার উপর আমল করাও সঠিক নয়।
অন্যদিকে সাধারণ বিবেকেও বিষয়টি সমর্থন করে না। কেননা যদি সত্যিকারার্থে রসূলের ভালোবাসা অন্তরে স্থান নিত তা হলে তো চুম্বনটি স্বয়ং মুয়াজ্জিনের মুখে দেওয়া উচিৎ ছিল। কারণ তাঁর নামটি তার মুখ থেকেই নিঃসৃত হচ্ছে। নিশ্চয় আঙুল থেকে নিঃসৃত হচ্ছে না, এবং আঙুলে তাঁর নামও লিখিত নেই। যেহেতু হাদীস দ্বারা এই কাজ প্রমাণিত নয়, তাই শরীয়তের বিধান মনে করে তা করলে নিঃসন্দেহে বিদআত হবে।
অনুরূপভাবে আজানের পুর্বে সালাম ও দরূদ পাঠ করাও বিদ'আত। কেননা তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে আজানের পরে দুআ পাঠের পূর্বে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। আজানের পরের করণীয় সম্পর্কে রসূলে করীম (স.) বলেছেনঃ

قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا إِنْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ

আজানের সময় মুযাজ্জিন যা বলে তোমারাও তাই বল। আর আজান শেষ হলে আল্লাহর কাছে যা চাও তা দেওয়া হবে।
অতএব শরীয়তের বিধান হলো আজানের পরে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া এবং নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করা হলো রসূলের আদর্শ, অন্য কিছু করা নয়।
আজানের পর দুআ পাঠ করার প্রতি রসূলে করীম (স.) সাহাবীদের উৎসাহিত করতেন। হযরত জাবির হতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, তিনি বলেন রসূলে করীম (স.) বলেছেন, আজানের পর যে ব্যক্তি এই দুয়া (নিম্নে প্রদত্ত) পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত করা আমার পক্ষে কর্তব্য হয়ে যাবে। (মিশকাত)

দুয়াটি এইঃ
اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

খতমে খাজেগান সম্পর্কে আলোচনা

বিপদ-আপদ দূরি করণের লক্ষ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ দুয়া পাঠকে খতমে খাজেগান বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এর প্রচল দেখতে পাওয়া যায়। এটি রসূলের কোন হাদীস দ্বারা এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের থেকে প্রমাণিত নয়। এমন কি চার ইমাম গণের কেউ কখনো করেননি। এটিও সুফিগণ কর্তৃক নব আবিষ্কৃত একটি কাজ । যদি কেউ এটিকে শরীয়তের নির্দেশ বা বিধান মনে করে পালন করে তবে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত হবে। আর দ্বীনের কাজ মনে না করলে দ্বীন-হীন কাজ। সে হিসেব এটি বর্জনীয়। তার পরও সকলকে (ছাত্রদেরকে) ডেকে সে কাজ করাতো আরো খারাপ একটি বিষয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান এবং সঠিক হাদীসের উপর আমল করানোর ব্যাপারে অভ্যাসের অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ তাদেরকে তালীমে দ্বীন এবং তরিয়্যতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া চাই। সে ক্ষেত্রে বিষয়টির দিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলী নজর দিবেন বলে আশা করি। (ফয়জুল কালাম)

খতেব ইউনুছ সম্পর্কে আলোচনা

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত একটি আয়াত দুঁয়ায়ে ইউনুছ নামে খ্যাত। এটি একটি বরকতময় দুঁআ। আয়াতটি বিপদ-আপদের সময় পাঠ করলে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে এই দুঁয়া পাঠের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই সকলের উচিত এই দুঁআ বেশি বেশি পাঠ করা। কিন্তু বর্তমানে যে পদ্ধতিতে এই দুঁআ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে দেখা যায়, তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সলফে সালেহীন হতেও তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ পদ্ধতি সুফি-সাধকদের উদ্ভাবিত। সমবেত হয়ে প্রচলিত নিয়মে এ দুঁআ পাঠ করা সুন্নতের খেলাপ। আর যদি ইবাদত মনে না করে দুনিয়ার কোন কাজ মনে করা হয়, তবে তার জন্য এতো গুরুত্ব দেওয়া অনুচিত বিশেষ করে মসজিদের অভ্যন্তরে। যদি বিপদ-আপদ দূর করার জন্য কোন কাজ করতে হয়, তবে তার জন্য তো শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে। মারাত্মক মছিবতে আক্রান্ত হলে ফজরের নামাজে **কুনুতে নাযেলা** পড়ার বিধান রয়েছে। সেটি করা সুন্নত।

কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের কিতাব সমূহ হতে জানা যায় যে, বিপদে পতিত হলে কয়েকটি কাজ করা দরকার। যথা-

১. নির্ভেজাল তাওবা করা।
২. অন্যায়-অপকর্ম কাজসমূহ পরিত্যাগ করা।
৩. সুন্নত ও নফল নামাজে মনোনিবেশ করা।
❖ ৪. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে গুরুত্বসহকারে আদায় করা।
৫. অধিক পরিমাণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৬. সাধ্যমত দান-খয়রাত করা ইত্যাদি।

এ সমস্ত কাজ বালা-মুছিবত হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উত্তম মাধ্যম। কাজেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করে অন্য আর সকল পদ্ধতি পরিত্যাগ করা আবশ্যক। কারণ অন্য পদ্ধতির ব্যাপারে শরীয়তের কোন দলীল নেই। এগুলো দ্বীনের নামে নবআবিস্কৃত বিষয়; যা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (ফয়জুল কালাম)

মুসাফাহার বিধান

পরস্পর দেখা-সাক্ষাত হলে সালামের পর মুসাফাহা করা একটি সামাজিক বিধান। এতে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় যেমন, তেমন ভালবাসা, হৃদ্রতা, ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার জন্যও রয়েছে শরীয়তের বিধান। বর্তমানে অনেক স্থানে দেখা যায় যে, ফরজ নামাজ শেষে পাশের মুসল্লীদের সাথে মুসাফাহা করতে। এমন মুসাফাহার ব্যাপারে শরীয়তের কোন বিধান নেই। তাই এটিকে শরীয়তের বিধান মনে করে কেউ পালন করলে তা বিদআতে পরিণত হবে।

আল্লামা ত্বিবী (রহ.) এব্যাপারে বলেন,

وَفِي الْمُلْتَقِطِ يُكْرَهُ الْمُصَافَحَةُ بَعْدَ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ فَاِنَّهَا مِنْ سُنَنِ الرَّوَافِضِ وَهٰكَذَا الْحُكْمُ فِى الْمُعَانَقَةِ. الجنة ١٣٠

মুলতাকি নামক গ্রন্থে আছে, নামাজের পর সর্বাবস্থায় মুসাফাহা করা মাকরুহ। কারণ এটি রাফেজী সম্প্রদায়ের পদ্ধতি। মুয়ানাকারও একই হুকুম। (আলজুন্নাহঃ ১৩০)

আজায়িফী নববী নামক কিতাবে বলা হয়েছেঃ

وَمَا يَفْعَلُ الْعَوَامُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ اَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ اَوْ بَعْدَ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ اَوْ بَعْدَ الْعِيْدِ فَهُوَ بِدْعَةٌ مَمْنُوعَةٌ

সাধারণ ব্যক্তিবর্গ জুমার নামাজ শেষে অথবা ফজর নামাজের পরে অথবা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে অথবা ঈদের নামাজের পরে যে মুসাহাফা করে তা নিষিদ্ধ এবং বিদ'আত।

ফাতওয়ায়ে **শামী**র মধ্যে উল্লেখ আছে,

وَلِهٰذَا صَرَّحَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ غَيْرُهُمْ بِكَرَاهَةِ الْمُصَافَحَةِ الْمُعْتَادَةِ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ مَعَ اَنَّ الْمُصَافَحَةَ سُنَّةٌ وَمَا ذٰلِكَ اِلَّا لِكَوْنِهَا لَمْ تُؤْثَرْ فِي خُصُوْصِ هٰذَا الْمَوَاضِعَ فَالْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا تَوَهَّمَ الْعَوَامَ بِاَنَّهَا سُنَّةٌ فِيْهِ .

হানাফী মাযহাবের এবং অন্যান্য মাযহাবের ওলামাগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুসাফাহা করা সুন্নত ঠিকই তবে নামাজের শেষে তা করা (আজ) অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর এটি এজন্য যে, মুসাফাহা করা উক্ত সময়ের সাথে (নামাজের শেষে) নির্দিষ্ট নয়। যদি তেমন করা হয় তবে সাধারণ মানুষ উক্ত সময়ে মুসাফাহা করাকে সুন্নত মনে করে নিবে।

এ ব্যাপারে আল্লামা শামী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **শামী**-তে উল্লেখ করেছেনঃ

تَكْرَهُ الْمُصَافَحَةُ بَعْدَ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ بِكُلِّ حَالٍ لِاَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مَا صَافَحُوا بَعْدَ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ لِاَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الرَّوَافِضِ الخ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ اِبْنِ حَجَرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ اَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوْهَةٌ لَا اَصْلَ لَهَا فِي الشَّرْعِ الخ . (شامى ، ج ٥ ، ص ٣٧٦ ، امداد الاحكام ، ج ١ ، ص ١٩٥)

নামাজের পর সর্বাবস্থায় মুসাফাহা করা মাকরুহ। কেননা সাহাবায়ে কেরাম নামাজের পর মুসাফাহা করেন নি। মাকরুহ হওয়ার আর একটি কারণ হলো এটি রাফেজী সম্প্রদায়ের নীতি। অতঃপর তিনি ইবনে হাজার শাফেয়ী (রহ.) হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন নামাজের পর সর্বাবস্তায় মুসাফাহা করা মাকরুহ ও বিদ'আত। শরীয়তে এর কোন মৌলিকত্ব নেই।

(ফাতওয়ায়ে শামীঃ খন্ড ৫ম, পৃ. ৩৭৬, ইমদাদুল আহকামঃ খন্ড১, পৃ.১৯৫)

০০০০

জানাযার নামাজের পর মুনাজাত সম্পর্কে আলোচনা

মানুষ মারা গেলে তার সকল প্রকার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে ছদকায়ে জারিয়ার কিছু করে থাকলে তার প্রতিদান সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে। তবে মৃত্যুর পরে তার আপনজন এবং আত্মীয় স্বজন তার জন্য যে ভাল কাজ করতে পারে তা হলো তার মাগফেরাতের জন্য দু'আ করা। এই দু'আ যে কোন সময় একা একা করা যেতে পারে। তবে সম্মিলিভাবে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ কেবল মাত্র জানাযার নামাজ দ্বারা করা বৈধ। কারণ রসূলে করীম (স.) নিজে, সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ জানাযার নামাজ সম্মিলিতভাবে পড়েছেন। তবে নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কারণে হানাফী আইন বিশারদগণ নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আবু বকর ইবনে হামেদ আল হানাফী বলেন,

إِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوْهٌ

জানাযা নামাজের পর দু'আ করা মাকরুহঃ (মুহিত)

মুফতী আল্লামা সাদগী আল হানাফী (রহ.) বলেন,

لَا يَقُوْمُ الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ (قنية. ج ١، ٥٦)

জানাযার নামাজের পর কোন মানুষ দু'আর জন্য দাঁড়াবে না। (ক্বিন্নিয়াঃ খন্ড১, পৃ. ৫৬)

ইমাম তাহের ইবনে আহমাদ আল বুখারী আল হানাফী বলেনঃ

لَا يَقُوْمُ بِالدُّعَاءِ فِى قِرَأَةِ الْقُرْآنِ لِاَجْلِ الْمَيِّتِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ وَقَبْلَهَا (خلاصة الفتوى. ج ١، ٢٢٥)

জানাযার নামাজের পূর্বে এবং পরে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দু'আ কার যাবে না। (খুলাসাতুল ফাতওয়াঃ খন্ড১, পৃ. ২২৫)

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

لَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِاَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِى صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ . مرقات. ج ٢. ص ٢١٩)

জনাযার নামাজের পর মৃত্যু ব্যক্তির জন্য (সম্মিলিত ভাবে আর কোন) দু'আ করবে না। কেননা তা জানাযার অতিরিক্ত করার ন্যায়। (মিরকাতঃ ২. ২. ২১৯)

কাজেই জানাযা নামাজের পর মায়্যেতের জন্য আর কোন দুআ করার প্রয়োজন নেই। কেননা নামাজ শেষে সম্মিলিতভাবে দুয়া করার কোন প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায় না। অথচ বর্তমানে এই প্রথাটি আমাদের সমাজে চালু আছে, যা একান্তভাবে পরিত্যাজ্য।

ওরস করা প্রসঙ্গেঃ

ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সাথে বন্ধুত্ব ও সু-সম্পর্ক রাখা আল্লাহর সাথে ভালবাসা রাখারই নামান্তর। তাদের অনুসরণ করে সঠিক পথে চলা আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি বড় মাধ্যম। তাদের মৃত্যুর পর শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় ইসালে সওয়াব করা এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় আমল। সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কবর যদি নিকটে হয়ে থাকে, তবে সেখানে উপস্থিত হয়ে সুন্নত মোতাবেক সালাম দিয়ে দুয়া করা জায়েজ। তবে কবর দূরে হলে শুধুমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তথায় ভ্রমণ করা বৈধ নয়। হাদীসে সেটিকে নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম (স.) বলেনঃ

لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ভ্রমণ করবে না।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহ্লবী এ হাদীসের আলোকে বলেনঃ

> যে ব্যক্তি আজমীরে অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কবরের নিকট কোন কিছু চাওয়া বা পাওয়ার আশায় গেল, তবে নিঃসন্দেহে মানব হত্যা ও জ্বিনা করার থেকেও বেশি অপরাধ করল। (তাফহীমাতে ইলাহীঃ ২/৪৫)

কবর যেয়ারতের জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা বা সে দিনে অনেকে একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে কোন প্রমাণ নাই। যেমন বছরের একটি বিশেষ দিনে কোন ব্যক্তির কবরে উপস্থিত হওয়া এবং বিপুলায়জনে অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে হুজুর (স.) ইরশাদ করেনঃ لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا। তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানায়ো না।

মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যাতে বলেন, لَا تَجْتَمِعُوا لِلزِّيَارَةِ اِجْتِمَاعَكُمْ لِلْعِيْدِ (তামরা ঈদের ন্যয় কবর যিয়ারতে সমবেত হবে না) বর্তমানের ওরস উক্ত হাদীসের আলোকে নিষিদ্ধ।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যাতে বলেনঃ

لَا تَجْعَلُوْا زِيَارَةَ قَبْرِىْ عِيْدًا، اَقُوْلُ هٰذَا اِشَارَةٌ اِلٰى سَدِّ مَدْخَلِ التَّحْرِيْفِ كَمَا فَعَلَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى بِقُبُوْرِ اَنْبِيَاءِهِمْ وَجَعَلُوْهَا عِيْدًا وَمَوْسِمًا بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ (حجة الله البالغة. ج ٢. ص٧٧)

হুজুর (স.) এর বাণী لَا تَجْعَلُوا زِيَارَةَ قَبْرِىْ عِيْدًا। সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, তাতে তাহরীফ তথা ধর্মে পরিবর্তনের দ্বার বন্ধ করে দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন ইহুদি ও নাসারারা স্বীয় নবীগণের কবরকে হজ্বের মত ঈদ ও পর্ব বানিয়ে ধর্মকে পরিবর্তন করেছিল।

অর্থাৎ হজ্ব যেমন নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে যেমন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তেমন ইহুদি ও নাসারারা নবীদের কবরকে কেন্দ্র করে তেমন অনুষ্ঠান করত ও গুরুত্ব দিত। এভাবেই তারা দ্বীনেহক হতে বেরিয়ে পড়ে।

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) এ ব্যাপারে বলেন,

وَلَا يَجُوْزُ مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ بِقُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ مِنَ السُّجُوْدِ وَالطَّوَافِ حَوْلَهَا وَاتِّخَاذِ السُّرُجِ وَالْمَسَاجِدِ اِلَيْهَا وَمِنَ الْاِجْتِمَاعِ بَعْدَ الْحَوْلِ كَالْاَعْيَادِ وَيُسَمُّوْنَهُ عُرْسًا (تفسير مظهرى، ج ٢، ٦٥)

অজ্ঞ লোকেরা শহীদ এবং আউলিয়াদের কবরের সাথে যেরূপ ব্যবহার করে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। আর তা হলো কবরকে সিজদা করা, প্রদক্ষীণ করা, বাতি জ্বালান অথা আলোক সজ্জাকরা, সেটাকে সেজদার স্থান বানিয়ে নেয়া এবং প্রতি বছর সেখানে একত্রিত হয়ে আনন্দ করা----যার নাম দেয়া হয়েছে উরস। এসব অবৈধ। (তাফসীরে মুজহেরীঃ ২/৬৫)

এ ব্যাপারে শাইখ আলী মুত্তাকী আল হানাফী (রহ.) বলেন,

اَلْاِجْتِمَاعُ لِقِرَأَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالتَّخْصِيْصِ فِى الْمَقْبَرِ اَوِالْمَسْجِدِ اَوِ الْبَيْتِ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ

নির্দিষ্ট করে কোন কবরে অথবা মাসজিদে অথবা ঘরে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠের নিমিত্তে একত্রিত হওয়া নিকৃষ্টতম বিদআত।

সুতরাং উরসের নামে অলী-আল্লাহদের কবরে যে মেলার অনুষ্ঠান বসানোর প্রথা সমাজে প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ না-জায়িজ ও হারাম। উল্লেখ্য সেখানে এমন কিছু কাজও হয় যা শিরকের পার্যায়ে পড়ে। কাজেই ওই অনুষ্ঠানে যোগদান করা হারাম।

***

ইসালে সাওয়াবের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা

মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাত কামনার জন্য দান করা, ইস্তেগফার করা, কুরআন তেলাওয়াত করা (পারিশ্রমিক গ্রহণ ব্যতীত), নফল নামাজ আদায় করা ইত্যাদি বৈধ কাজ। তবে ইসালে সওয়াবের জন্য শরীয়তে কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। ইসালে সওয়াবের জন্য দুই দিন, তিন দিন, ৪দিন নির্দিষ্ট করা হিন্দু প্রথার অংগ। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আলবেরুণী এ ব্যাপারে লিখেছেনঃ

> হিন্দু মৃত ব্যক্তির উত্তরসূরীদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা হলো খাদ্য খাওয়ান। মৃত্যুর তারিখ হতে এগারতম এবং পনেরতম দিনে আহার করান। এভাবে প্রতি বছর আহার করানোটি হিন্দু ধর্মে অনেকটা আবশ্যক। নয় দিন পর্যন্ত ঘরের সামনে খানা পাকিয়ে এবং পানির পেয়ালা ভরে রাখতে হয়, অন্যথায় তাদের মর্ধমতে মৃত ব্যক্তির আত্মা অসন্তুষ্ট হয় (এবং এটিই তাদের বিশ্বাস) এবং ক্ষৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে ঘরের চারপাশে ঘুরতে থাকে।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী (রহ.) কে লিখিত প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ

عَمَّا يَعْمَلُ يَوْمَ ثَالِثٍ مِنْ مَوْتِهِ مِنْ تَهْيِئَةِ اَكْلٍ وَ اِطْعَامِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَعَمَّا يَعْمَلُ يَوْمَ السَّابِعِ الخ

কেউ মৃত্যু বরণ করলে ৩য় দিনে ফকির-মিসকীনের জন্য যে আহার করানো (ব্যবস্থা করা) হয় এমনি ভাবে যা সপ্তাহ ধরে চলে, তার বিধান কি?

তার উত্তরে তিনি বলেছিনেলঃ جَمِيْعُ مَا يَفْعَلُ مِمَّا ذُكِرَ فِى السُّوَالِ مِنَ الْبِدَعِ الْمَذْمُوْمَةِ ، فتاوى كبرى (প্রশ্নে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর সবগুলা নিকৃষ্ট বিদআত, ফাতওয়ায়ে কুবরাঃ ২/৭, রাহে সুন্নতঃ ২৬৩)

ইমাম কাজীখান এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেনঃ

وَيُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِىْ اَيَّامِ الْمُصِيْبَةِ لِاَنَّهَا اَيَّامُ تَأَسُّفٍ فَلَا يَلِيْقُ بِهَا مَا كَانَ لِلسُّرُوْرِ، فتاوى خانية، ج٤، ص ٧٨١)

মছিবতের দিনসমূহে যিয়াফত করা মাকরুহ। কেননা যে কাজ খুশির সময় হয় তা দুঃখের সময়ে করা ঠিক নয়। (ফাতওয়ায়ে খানিয়্যাহঃখন্ড ৪, পৃ.৭৮১)

ইমাম হাফিজ উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে শিহাব কায়দরী আল হানাফী (রহ) বলেন,

وَيَكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَ اَكْلُهَا لِاَنَّهَا مَشْرُوْعَةٌ لِلسُّرُوْرِ وَ يَكْرَهُ اِتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَ بَعْدَ الْاُسْبُوْعِ وَ الْاَعْيَادِ وَ نَقْلُ طَعَامٍ اِلَى الْقَبْرِ فِي الْمَوَاسِمِ وَ اِتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ لِقِرَاْءَةِ الْقُرْآنِ وَ جَمْعُ الصُّلَحَاءِ وَالْقُرَّاءِ لِلْخَتْمِ اَوْ لِقِرَاْءَةِ سُوْرَةِ اِنْعَامٍ اَوْ الْاِخْلَاصِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ اِتِّخَاذَ الطَّعَامِ عِنْدَ قِرَاْءَةِ الْقُرْآنِ لِاَجْلِ الْاَكْلِ يَكْرَهُ (فتاوى بزازية، ج ٤، ٨١)

তিনদিন ধরে ভোজানুষ্ঠান করা এ অনুষ্ঠানের খাদ্য আহার করা মাকরুহ। কেননা ভোজানুষ্ঠান খুশির বিষয়। (এভাবে) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন রান্না-বান্না করা মাকরুহ। সপ্তাহের (নির্দিষ্ট দিনে), ঈদের দিনে রান্না করে সে খাদ্য কবরস্হানে নিয়ে যাওয়া মাকরুহ। নেক বান্দাদের দ্বারা কুরআন পাঠ করানোর জন্য একত্রিত করাও মাকরুহ। (এলাকা ভিত্তিক প্রথা হিসেবে) সূরা আনয়াম অথবা সূরা এখলাছ পাঠের জন্য আহারের ব্যবস্হা করাও মাকরুহ। মোট কথা (ইসালে সাওয়াবের নিমিত্তে) কুরআন পাঠ করে আহার করানোর নিমিত্তে খানা পাক করা মাকরুহ। (ফাতওয়ায়ে বাজ্জাজিয়াঃ খন্ড ৪, পৃ. ৮১)

কাজেই জানা গেল যে, ইসালে সাওয়াবের জন্য কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই। এভাবে মৃত্যু বার্ষিকী পালন করাও বর্জনীয়। এটি ইহুদি, নাসারা ও হিন্দুদের প্রথা।

কুরআন তেলওয়াত করে প্রতিদান গ্রহণ

কুরআন তেলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত। প্রতিদান গ্রহণ না করে বা প্রতিদান না দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে তা মৃত ব্যক্তির নামে উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো যায়। তবে প্রতিদান গ্রহণ ও প্রদান হলে তাতে সাওয়াব হবে না। এব্যাপারে আল্লামা মাহমুদ আহমদ আল হানাফী হিদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাতে লিখেছেন,

اِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْاُجْرَةِ الثَّوَابَ لِلْمَيِّتِ وَلَا لِلْقَارِى۔

(انوار ساطعة، ١٠٧)

বিনিময়ের পরিবর্তে যে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তার সওয়াব মৃত ব্যক্তি এবং পাঠক কেউ পাবে না। (আনওয়ারে সাত্বেয়াঃ১০৭)
আল্লামা আইনী বলেনঃ

اَلاٰخِذُ وَالْمُعْطِىْ آثِمَانِ فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَا شَاعَ فِى زَمَانِنَا مِنْ قِرْأَةِ الْاَجْزَاءِ بِالْاُجْرَةِ لَا يَجُوْزُ ، (بناية شرح هداية ، ج ، ٣ ، ص ٦٥٥)

প্রতিদান গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত করলে উভয়ই গোনাহগার হবে। (বেনায়া শরহে হেদায়াঃ ৩/৬৫৫)

এ ব্যাপারে আল্লামা সদরুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদের মন্তব্যটিও প্রাণিধান যোগ্য। তিনি শরহে আক্বীদাতুত ত্বহাবী গ্রন্থের ৩৮৬ পৃষ্ঠাতে লিখেছেনঃ

وَاَمَّا اِسْتِئْجَارُ قَوْمٍ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَهْدُوْنَهُ لِلْمَيِّتِ فَهٰذَا لَمْ يَفْعَلْهُ اَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ وَ لَا اَمَرَ بِهِ اَحَدٌ مِّنْ اَئِمَّةِ الدِّيْنِ. وَلَا رَخَّصَ فِيْهِ وَالْاِسْتِئْجَارُ عَنْ نَفْسِ التِّلَاوَةِ غَيْرُ جَائِزٍ بِلَا خِلَافٍ (شرح عقيدة الطحاوى ، ٣٨٦)

বিনিময়ের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তা মৃত ব্যক্তির জন্য পাঠান সলফে সালেহীনের পথ নয়। ইমামদের মধ্যেও কেহ এমন আদেশ এবং অনুমতিও দেননি। মৃত ব্যক্তির নামে তেলওয়াত করে বিনিময় নেওয়া নাজয়িজ, এতে কারো দ্বিমত নেই।

আল্লামা রশীদ আহম গাঙ্গুহী রঃ বলেন, আমন্ত্রীত ব্যক্তিদেরকে যা কিছু দেয়া হয় তা তাদের দ্বারা কুরআন পড়ানোর বিনিময়েই দেয়া হয়। এমন হলে তার সাওয়াব পাঠকারী এবং মৃত ব্যক্তি কেহ পাবে না। সুতরাং এ ধরণের অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা তাতে বিনিময় প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়েই গোনাহগার হবে। তাই এরূপ কাজ হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। যদি মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য কিছু করতে হয়, তবে নিজে ঘরে বসে কুরআন তেলাওয়াত করে সেটি করা ভাল। তাতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতওয়ায়ে রশীদিয়াঃ ২/৮৪)

oooo

কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ

কবরের সম্মান বিনষ্ট করা না-জায়িয। যেমন কবরের উপর বসা, পদ দলিত করা, সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি। এটি বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু অধিক সম্মান দেখাতে গিয়ে কবর পাকা করা, তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা শরীয়ত বিরোধী কাজ। রসূলে করীম (স.), সাহাবায়ে কেরাম হতে এটি স্বীকৃত নয়। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসব করাকে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبْرُ وَ اَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ وَ اَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ ، رواه مسلم ، مشكوة ،١٤٨ .

রসূল (স.) কবরকে চুন-কাম (রং, ডিস্টেম্পার) করতে, তার উপর ঘর করতে ও বসতে নিষেধ করেছেনঃ (মুসলিমঃ মিশকাতঃ ১৪৮)

অর্থাৎ কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করা না-জায়িয কাজ। তেমন তৈরি হয়ে থাকলে তা ভেঙে ফেলা আবশ্যক, যদিও তা মসজিদ হয়ে থাকে।

কেউ কেউ হাদীসের অর্থ চুন-কাম বলতে সৌধ নির্মাণ অর্থ করেছেন। আর ঘর তোলার অর্থ তাঁবু খাটানো করেছেন। আর কবরে বসার উপর নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপনের কারণ হলো, তাতে মৃত ব্যক্তিকে অপমান করা হয়। অনেকে শোকে কাতর হয়ে বিষাদ বদনে বসা অর্থ করেছেন। যেমন বর্তমানে কোন পীরের মাজারে কিছু লোক দিন-রাত ভন্ডামী করার জন্য বসে থাকে। (ফাতহুল মারাম)

নিচের আর একটি হাদীস এখানে উল্লেখ যোগ্য। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হাইয়াজ আসাদী হতে। তিনি বলেন,

قَالَ لِيْ عَلِيٌّ اَلَا اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَّا تَدَعْ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهٗ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهٗ(رواه مسلم . مشكوة : ١٤٨)

একবার হযরত আলী (রা.) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠাবো, যে কাজে হুজুর (স.) আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? তা হলো কোন মূর্তি দেখলে তা বিনষ্ট না করে (চূর্ণ-বিচূর্ণ) ছাড়বে না, উঁচু কবর দেখলে তা সমান না করে রাখবে না। (মুসলিম)

আযহার নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, কবর এক বিঘাত পরিমাণ উঁচু রাখা মুস্তাহাব। বেশি করা মাকরুহ; হলে কমিয়ে ফেলা মোস্তাহাব।

(ফাতহুল মারাম, ফয়জুল কালাম)

ইমাম নববী (রহ.) কবরের উপর সৌধ নির্মাণে নিষেধকৃত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেঃ

وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِى مِلْكِ الْبَانِى فَمَكْرُوْهٌ وَإِنْ كَانَ فِى مَقْبَرَةٍ مَسْبَلَةٍ فَحَرَامٌ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَالْأَصْحَابُ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ فِى الْأُمِّ وَرَأَيْتُ الْأَئِمَّةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُوْنَ بِهَدَمِ مَا يُبْنٰى وَيُؤَيِّدُ الْهَدَمَ قَوْلُهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا سَوَّيْتَهُ.

কবর যদি ব্যক্তিমালিকানাধীন হয় তবে তার উপর সৌধ নির্মাণ করা মাকরুহ। আর যদি সর্বসাধারণের কবর হয়, তবে (সৌধ নির্মাণ) হারাম। ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্য ধর্মীয় পন্ডিতগণ তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী উম নামক কিতাবে লিখেছেন, আমি মক্কা মুকাররামায় ইমামদেরকে কবরের উপর সৌধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার আদেশ প্রদান করতে দেখেছি। তাদের এই কাজ কে (ولا قبرا مشرفا) হাদীস সমর্থন করে। (শরহে মুসলিমঃ ৩১২)

উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, কবর পাকা করা বা তার উপর সৌধ নির্মাণ করা অবৈধ। তবে কবর সংরক্ষণের জন্য বেষ্টনী প্রদান করা যেতে পারে।
হযরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত অন্য আর একটি হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُوْطَأَ. (رواه الترمذى . مشكوة . ١٤٨)

কবরকে চুনকাম (রং, ডিস্টেম্পার ইত্যাদি) করতে, তার উপর লিখতে এবং পায়ে মাড়াতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিজী, মিশকাতঃ ১৪৭ পৃ.)।
উল্লিখিত হাদীসের আলোকে হাদীস বিশারদগণ কবরের উপর আল্লাহর নাম, তার রাসূলের নাম, কুরআন মাজীদের আয়াত ইত্যাদি লেখা মাকরুহ বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে পাথরে মৃত ব্যক্তির নাম, মৃত্যুর তারিখ, সময় ইত্যাদি খোদায় করে লেখাকেও মাকরুহ বলেছেন। অনেকে মৃতব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা লোক হলে তার কবরকে চিহ্নিত করার জন্য ফলক রাখা জায়েজ বলেছেন।

(ফয়জুল কালামঃ ৩৩৭)

কবরকে মসজিদে পরিণত করা

কবর পূজা বর্তমান সমাজে সংক্রামক ব্যাধীর ন্যায় বিস্তার লাভ করেছে। এক শ্রেণীর মানুষ মাজারে গিয়ে শরীয়ত বিরোধী এবং কখনো কখনো শিরকী কাজ পর্যন্ত করেছে। কবরে গিয়ে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধী হতে আরোগ্য কামনা করছে, কবরের মৃত ব্যক্তির নিকট ব্যবসায় উন্নতি, মামলায় বিজয়, চাকুরী লাভে সহায়তা ইত্যাদি চাচ্ছে। কবরে দিচ্ছে টাকা-পয়সা, গরু-মহিষ, চাল-ডাল আরো কত কি? মেয়েরা তাদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিচ্ছে। অনেকে কপাল ঠেকিয়ে সেজদা পর্যন্ত করছে। অথচ মহানবী (স.) এব্যাপারে কঠোর হুসিয়ারী উচ্চারণ করে বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، رواه مالك ، مشكوة،

হে আল্লাহ ! আমার কবরকে প্রতীমা বানায়ো না যাতে পূজা হতে থাকবে। আল্লাহর কঠোর রোষানলে পতিত হয়েছে সেই জাতি, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে (কবরে সেজদা করে) পরিণত করেছে। (মিশকাতঃ ৭২)

অর্থাৎ আমার কবরকে প্রতীমা পূজারীদের প্রতীমার মত বানায়ো না। তারা প্রতিমাকে যেমন সুন্দর কাপড় পরিধান করায়, সেজদা করে, তার নিকট মনবাসনা পূর্ণের জন্য প্রার্থনা করে, যেয়ারত করার জন্য মেলা বসায়, নানাবিধ অনুষ্ঠান করে আমার কবর যেন তেমন না হয়।

এ ব্যাপারে অন্য এক রেওয়েতে এসেছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. (متفق عليه ، مشكوة. ص ٦٩)

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল (স.) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই রোগে অসুস্থ্য থাকাকালীন সময়ে বলেছেন, ইহুদি ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশম্পাত বর্ষিত হোক। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাতঃ ৬৯)

অর্থাৎ মরণব্যাধিতে পতিত হয়ে মহা নবী (স.) উম্মতের ভবিষ্যত শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডের আশঙ্কা করছিলেন। তা হলো তারা যেন ইহুদি ও নাসারাদের

ন্যায় তাঁর কবরকেই সেজদার স্থানে পরিণত না করে। আর যখন এই আশঙ্কা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল তখন তিনি ওই দুই জাতির প্রতি অভিশম্পাত বর্ষণ করে স্বীয় উম্মতের জন্য চরম হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

কবরকে মসজিদ বানানোর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. কবরকে সেজদা করা, যাতে কবরকেই ইবাদত করা উদ্দেশ্য থাকেঃ দুই. কবরকে মাধ্যম হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সেজদা করা। সেক্ষেত্রে কবরকে সেজ্দা করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পন্থা মনে করা। উল্লেখ্য, এ দুটি পদ্ধতিই হারাম। কারণ এসমস্ত কাজ করার অর্থ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার নামান্তর; যদিও তা লঘু শির্ক হোক না কেন। হাদীসে উল্লিখিত অভিশম্পাত লঘু ও গুরু শির্ক উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। আর সম্মান প্রদর্শনের জন্য অথবা বরকত অর্জনের জন্য কোন নবী, সাহাবী, অলী আল্লাহর কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করা হারাম। এব্যাপারে সমস্ত ওলামাগণ একমত। (ফাতহুল মারাম)

হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَلاَ وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ وَ صَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ اِنِّي اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ (مسلم : مشكوة، ٦٢)

আমি হুজুর (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, সাবধান! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবীদের ও নেক মানুষের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল (তোমরা তেমন করো না) সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করছি।

(মুসলিম, মিশকাতঃ ৬৯)

অর্থাৎ কবরকে সিজদা করা অথবা কবরকে সামনে করে আল্লাহকে সেজদা করা এবং তা বরকতময় মনে করা শিরক।

অন্য আর একটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিতঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ٠

হুজুর (স.) সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদের অভিশম্পাত প্রদান করেছেন,যারা কবর যেয়ারত করতে যায়, যারা কবরকে মসজিদ বানায় এবং বাতি জ্বালায়।

(আবু দাউদ, মিশকতাঃ ৭১)

হযরত আমর ইবনুল আস এই বলে ওসিয়ত করেছিলেন যে, فَاِذَا اَنَامِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ (আমার মৃত্যু হলে যেন ক্রন্দনকারী মহিলা আমার সাথে গমন না করে এবং আগুন যেন না আসে। (মুসলিমঃ ১/৭৬)
হযরত আসমা বিনতে আবু বকরও অনুরূপ অসিয়ত করেছিলেন। হাফেজ ইবনে কাইয়ূম লিখেছেনঃ
نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ وَ اِيْقَادِ السُّرُوْجِ عَلَيْهَا (زاد المعاد، ١٤٦)
হুজুর (স.) কবরকে সিজদার স্থান বানাতে, কবরে বাতি প্রজ্বলিত করতে নিষেধ করেছেন। (যাদুল মায়াদ)
অতএব জানা গেল যে, কবরে বাতি প্রজ্জলিত করা নাজায়েজ কাজ। একইভাবে তাতে দামী চাদর দিয়ে ঢাকা, ফুল ছড়ানো ইত্যাদি করা অনর্থক কাজ ও বিদআত।

যিয়ারতের সুন্নত তরিকা

শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী কবর যিয়ারত করা উত্তম কাজ। কেননা তাতে আখেরাতের স্মরণ হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে মাসউদ(রা.) বর্ণনা করেছেনঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرَ الْاٰخِرَةَ رواه ابن ماجة، مشكوة، ١٤٥ وَفِى رَوَايَةِ الْمُسْلِمِ فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، مشكوة، ١٥٤.

রসুলুল্লাহ (স.) বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা কর। কেননা তা দুনিয়ার আসক্তি কমিয়ে দেয় এবং আখেরাতকে স্মরণ করায়। (ইবনে মাজা, মিশকাতঃ ১৫৪) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটি মৃত্যুকে স্মরণ করায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নও মুসলিমদের থেকে আপত্তিকর কাজ ও শির্ক প্রকাশের আশঙ্কায় কবর যিয়ারত নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাদের অন্তরে ইসলামী আকীদা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলো, তখন কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হলো। তাই কবর যিয়ারত এখন সর্ব সম্মতিক্রমে মুস্তাহাব কাজে পরিণত হয়েছে। হুজুর (স.) নিজেও জান্নাতুল বাকীতে যেতেন এবং কবরবাসীদের প্রতি সালাম দিতেন। মহিলাদের কবর যিয়ারতে না যাওয়া উত্তম। তবে রসূল (স.) এর কবর যিয়ারত মহিলাগণও করতে পারবে।

যিয়ারতের নিয়ম হলো, কিবলার দিক দিয়ে দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান পূর্বক এই দুয়া পাঠ করবে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والمسلمين وَالْمُسْلِمَاتِ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ اَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

অতপর সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাছ ইত্যাদি দুআ-কালাম পাঠ করে একা একা কিবলার দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে অথবা এমনিতেই দুয়া করবে। জুমার দিন কবর যিয়ারত করা উত্তম। তবে কবরে হাত লাগান বা চুম্বন করা বা মস্তক অবনত করা হতে দূরে থাকতে হবে। কেননা ওসব খ্রিস্টানের প্রথা। (ফাতহুল মারাম)।

শোক পালনে ইসলামী বিধান

আপন জনের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া মানুষের ধর্ম। অনেকে শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। অনেকের আত্মা প্লাবিত হয় শোকের বন্যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইসলামী বিধান রয়েছে। ইসলামী বিধান হলো কেউ মারা গেলে তার জন্য মাত্র তিন দিন শোক পালন করা যাবে। তবে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য এ বিধান নয়। এব্যাপারে রসূল (স.) এর একটি হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। তিনি বলেনঃ

لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يُّحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،

কোন মুসলমানের জন্য তিন দিনের অতিরিক্ত শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে (স্বামী মারা গেলে) স্ত্রী চারমাস দশদিন শোক পালন করবে। (আবু দাউদ)
তবে এক্ষেত্রে স্ত্রীকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন অন্ধকার যুগের নারীদের মত চিৎকার করে কান্না-কাটি প্রকাশ না পায়। মহানবী (স.) এব্যাপারে বলেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَ دَعٰى بِدَعْوٰى الْجَاهِلِيَّةِ

সে ব্যক্তি আমাদের দলভূক্ত নয়, যে মুখ চাপড়িয়ে জাহেলী যুগের মত চিৎকার করে কাঁদে এবং কাপড় ছেঁড়ে। (বুখারী ও মুসলিম।)
তিনি আরো বলেনঃ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَ خَرَقَ (সে আমাদের দলভূক্ত নয় যে, মাথা ন্যাড়া করে, চিৎকার করে কাঁদে ও কাপড় ছেঁড়ে। (বুখারী)
আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এসেছেঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ

(মৃত ব্যক্তির জন্য) যে মহিলা উচ্চ স্বরে কাঁদে এবং তা যে মহিল শ্রবণ করে উভয়কে রসূল (স.) অভিশম্পাত করেছেন।
হযরত ওমর (রা.) হতে একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ

قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهٖ بِمَانِيْحَ عَلَيْهِ.

মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপের কারণে কবরে (মৃত ব্যক্তিকে) শাস্তি প্রদান করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে বিলাপের কারণে কবরে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। হরত আবি মালেক আশ্‌আরী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নরূপঃ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرْبٍ،

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তি জন্য ক্রন্দকারী (নিজের) মৃত্যুর পুর্বে তাওবা না করলে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরি পোশাক ও দস্তার তৈরি জামা পরে উঠান হবে। (মুসলিম)

আশুরা পালন প্রসঙ্গে

"মহরম" হিজরী সনের প্রথম মাস এবং পবিত্র মাস। এমাসে রক্তপাত করা নিষেধ ~~ছিল~~। এ মাসের অনেক ফযিলাত ও গুরুত্ব রয়েছে। এ মাসের নির্দিষ্ট দিনে ঘটে যাওয়া অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে একটি বিষাদময় ঘটনারও অবতারণা হয়েছে। তা হলো হযরত হোসেন (রা.) এর শাহাদত বরণ করা। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ এমাসের ১০ তারিখে অনর্থক কিছু কাজ করে রক্তের হোলী খেলে। ইসলামী বিধানকে জলাঞ্জলী দিয়ে আশুরা পালনের নামে অনৈসলামীক কাজে লিপ্ত সমাজের অনেক লোক। এ ধরণের আশুরা পালন শরীয়ত সম্মত নয়। তাই তা বিদআত। ইসলামী বিধান মতে এ দিনটিতে নফল রোজা রাখা সুন্নত। এটি হযরত মুছা (আ.) এর কওম ফেরাউনের বন্দীশালা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার দিন। কিন্তু বর্তমান যুগের কিছু মানুষ হযরত হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে এ দিনটি পালন করে থাকে। এ পালন ইসলামী শরীয়ত সম্মত পন্থায় হয় না। তারা কৃত্রিম কবর বানিয়ে তার কাছে কল্যাণ কামনা করে, কবরের ধূলা শরীরে মর্দন করা, সেজদা করা, মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকা এবং বুক চাপড়িয়ে হায় হুসাইন, হায় হুসাইন বলে আর্তনাদ করা, শোক মিছিল করা, বাতি জ্বালান ইত্যাদি সব কাজ বরকতপূর্ণ মনে করে করা হয় যা বিদ'আত ও শিরকের পর্যায়।

মুহারম পর্ব ও ইসলাম

স্মরণ রাখা দরকার সুন্নতের নামে অনেক বিদআত আজ আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে। প্রকাশ্যে ইসলাম মনে হলেও মূলত তা ইসলামের নামে রচিত কুসংস্কার। এসবের মধ্যে একটি হলো মুহাররম পর্ব। কুরআন ও সুন্নাতে এর কোন প্রমাণ নেই। রসূল (স.) এর যুগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে জাহেলী যুগে ৪টি মাসকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হতো। কিন্তু পরবর্তী যুগে হযরত হুসাইনের শাহাদত বরণের পর এ দিনটি নতুন সাজে টেনে আনা হয়। অথচ এদিনটিতে অনেক কিছু ঘটে গেছে। এদিনে ফেরাউন পানিতে ডুবে মরে, ফেরাউনের বন্দী শালা হতে মুসার কওম পরিত্রাণ পায়। এটি ছিল হযরত মুছার জন্য বড় একটি বিজয়। সে জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নিমিত্তে এ দিনে ইহুদি ও খৃস্টানরা রোজা রাখতো। মহানবী (স.) মদীনায় হিজরত করার পর দেখলেন তারা রোজা রাখে। তাই তিনি বলনে, نحن احق بموسى (মুছার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখানোর হকদার আমরাই বেশি) তিনি এদিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। তবে তাদের অনুকরণ যাতে না হয় সে জন্য আগামী বছর হতে দুটি রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ২য় হিজরীতে রোজা পালন ফরজ হলে পূর্বের আদেশ শিথিল হয়ে যায়। নবী করীম (স.) এই মর্মে ঘোষণা করলেন যে, فمن شاء صام ومن شاء افطر (যে রোজা রাখতে ইচ্ছুক সে রাখবে, যে ইচ্ছুক নয় সে রাখবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, এদিনে রোজা রাখলে আল্লাহ তার বান্দাকে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেন।

***

জানাযা বহনের সময় উচ্চ শব্দে কালিমা পাঠ

প্রকাশ থাকে যে, জানাযা বহন কালে নীরব থাক কর্তব্য। তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ আছে,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ عِنْدَ الزَّحْفِ وَعِنْدَ الْجُنَازَةِ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন তেলাওয়াতের সময়, শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতরণের সময় ও জানাযার সময় নিশ্চুপ থাকা পছন্দ করেন।

বাহরুর রায়ীক নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ الْجَنَائِزِ وَ الْقِتَالِ وَالذِّكْرِ، (بحر الرائق، ج، ٥، ٧٦)

রসূল (স.) এর সাহাবীগণ তিন সময়ে উচ্চ শব্দ করাকে অপছন্দ করতেন। এক. জানাযার সময় দুই. যুদ্ধের ময়দানে তিন. যিকির করার সময়। (বহারুর রায়িকঃ ৫/৭৬)

ফাতওয়ায়ে আলমগীরে উল্লেখ রয়েছেঃ

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَ قِرَأَةِ الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُمْ كُلُّ حَيٍّ يَمُوْتُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ بِدْعَةٌ، عالمغيرى، ج١، ص ١٧٦)

উচ্চস্বরে যিকর করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে উচ্চস্বরে বলা বিদ'আত। অনুরূপভাবে জানাযার পেছনে চলতে চলতে উচ্চস্বরে কালিমা পড়া বিদ'আত। (আলমগীরীঃ ১/১৭৬)

বুঝা গেল জানাযার পেছনে উচ্চ স্বরে যিকর বা অন্য কোন দুয়া পড়া মাকরুহ কাজ সমূহের অন্তর্ভূক্ত। এর থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লামা ইবনে নুজায়ীম এ ব্যাপারে বলেনঃ

وَيَنْبَغِى لِمَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ اَنْ يُّطِيْلَ الصَّمْتَ وَ يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَ قِرَأَةِ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِهِمَا فِى الْجَنَازَةِ وَالْكِرَاهَةُ فِيْهَا كِرَاهَةُ تَحْرِيْمٍ، بحر الرائق، ج ٢، ص ١٩٩)

যারা যানাযার অনুসারী হবে তাদের উচিৎ দীর্ঘ নীরবতা পালন করা। (সে সময়) উচ্চ শব্দে যিকর করা, কুরআন তেলাওয়াত করা বা অন্য কিছু পাঠ করা মাকরুহ। এখানে মাকরুহ দ্বারা মাকরুহ তাহরিমী উদ্দেশ্য। (বাহরুর রায়েকঃ ২/১৯৯)

তবে হ্যা, আস্তে আস্তে জ্বিক্‌র করা যেতে পারে। তাতে বাধা নেই। ইমাম কাজীখান বলেন, وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ يَذْكُرُ فِيْ نَفْسِهِ (জানাযার সাথে) স্বজোরে জি্‌কর করা মাকরুহ। তবে কেহ নীরবে অন্তরে জিক্‌র করতে চাইলে করতে পারে। (ফাতওয়ায়ে কাজীখানঃ ১/৯১)

জানাযা সামনে রেখে মৃত ব্যক্তিকে ভাল বলে ঘোষণা দেয়া

আমাদের সমাজে অনেক স্থানে একাজটি করতে দেখা যায়। কোন এক ব্যক্তি সকলকে সম্বোধন করে বলে, মৃত এই ব্যক্তি কেমন ছিল? উত্তরে সকলে **ভাল ছিল** বলে। অথচ হতে পারে লোকটি সৎ, ধার্মীক ছিল না। এমতাবস্থায় যদি সে লোকটিকে ভাল বলে আখ্যা দেয়া হয় তবে তা মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে এবং গোনাহগার হবে। অথচ মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসিকদের দলভূক্ত। আর ফাসিকের সাক্ষ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই তাদের সাক্ষ দ্বারা মৃত ব্যক্তির কি উপকার হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। হাদীসে এসেছে যদি মুসলমানগণ কারো মৃত্যুর পর প্রসংশা করে তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যেনম হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِأُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ فَقَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْاَرْضِ. متفق عليه . رياض الصالحين .

কিছু সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে গমনকালে মৃতব্যক্তির প্রশংসা করেন। রসূলে করীম (স.) তা শ্রবন করে বললেন, অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে। অতপর তারা আরো একটি জানাযার পাশ দিয়ে গমন কালে তারা মৃত ব্যক্তি নিন্দা করলেন। তা শ্রবণে রসূল (স.) বললেন, অত্যাবশাক হয়ে গেছে। হযরত ওমর তখন জিজ্ঞাসা করলেন, কি অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা প্রথম ব্যক্তির প্রশংসা করেছ তাই তার প্রতি জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর ২য় ব্যক্তির কুৎসা বর্ণনা করেছ তাই তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষিস্বরূপ।

উল্লিখিত হাদীস হতে বুঝা গেল যে, যদি কোন মুসলিম কোন মুসলিম মৃত ব্যক্তির সততা, ধার্মিকতা, খোদাভীতি ইত্যাদির উপর সন্তুষ্ট হয়ে নিজের উদ্যোগে তার প্রশংসা করে তবে তা মৃত ব্যক্তির উপর বর্তাবে। তার অর্থ এই নয় যে, পূণ্যবান ব্যক্তির প্রশংসা না করলে তিনি জান্নাতে প্রবেশ লাভে সমর্থ হবেন না। বরং পুণ্যবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষের অন্তরে তার প্রশংসার দ্বার উন্মোচন করে দেন। কাজেই মৃত ব্যক্তি কেমন ছিল তা সবাইকে জানিয়ে ঘোষণা দেয়া ও অন্যদের মুখ হতে ঘোষণা নেয়া একটি নতুন প্রথা। হাদীসে এজাতীয় প্রথার প্রমাণ নাই। কাজেই লোকটি কেমন ছিল তা নিজে না জেনে তার সনদ দেয়া ঠিক নয়। কেননা জানাযায় উপস্থিত হওয়া সকল ব্যক্তি তার সম্পর্কে হয়ত কিছুই জানেন না। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের কাজ হতে বিরত থাকার তাউফিক দান করুন।

***

দাফনের পর করণীয় ও বর্জনীয় কাজসমূহ

দাফনের পর করণীয় ও বর্জনীয় কাজের প্রতি সকলের সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয়। এব্যাপারে হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ اَلْاٰنَ يُسْئَلُ، ابو داؤد ج ١، ص ٩٥)

মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য সম্পন্ন করে রসূলে করীম (স.) সেখান থেকে তৎক্ষণাত চলে যেতেন না। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করতেন এবং বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার জন্য দুআ কর। এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে। (আবু দাউদঃ ১/৯৫)

শরয়ী কোন ওজর না থাকলে দাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সুন্নত। হযরত আব্দুল্লহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছেঃ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاسْرِعُوا بِهِ اِلٰى قَبْرِهِ وَيَقْرَأُ عِنْدَ رَأْسِهِ • اَىْ بَعْدَ الدَّفَنِ) فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ (رواه البيهقى فى شعب الايمان وقال والصحيح انه موقوف عليه ، مشكوة ١٤٩)

আমি হুজুর (স.) কে বলতে শুনেছি, কেহ মৃত্যু বণর করলে (শরয়ী ওজর ব্যতীত) তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে না, দাফন কার্জ দ্রুত সম্পন্ন করবে। (দাফন কার্জ সম্পন্ন হলে) তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম আয়াতগুলো এবং পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে শেষের আয়াতগুলো পাঠ করবে। (মিশকাতঃ ১৯৪)

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)মৃত্য সয্যায় শায়িত অবস্থায় স্বীয় পুত্রকে অছিয়ত করে ছিলেনঃ

اِذَا مِتَّ فَلَا تَصْحَبْنِىْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ وَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَاْنِسَ بِكُمْ وَاَعْلَمُ مَاذَا رَاجِعٌ بِهِ رُسُلُ رَبِّىْ رواه مسلم - مشكوة ١٤٩)

এবং আগুন

আমি মৃত্যুবরণ করলে আমার জানাজার সাথে ক্রন্দনকারিনী যেন না থাকে। দাফনের সময় আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে। তারপর আমার কবরের পাশে একটি উট জবেহ্ করে গোশ্ত বন্টন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তবে আমি তোমাদের প্রীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবো এবং আমি আমার প্রভূর বার্তা বাহক্দের কি কি উত্তর দিব তা জেনে নিব। (মিশকাতঃ ১৪৯)

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাত-এ এহাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, قَوْلُهٗ ثُمَّ اَقِيْمُوا حَوْلَ قَبْرِيْ لَعَلَّهٗ لِلدُّعَاءِ بِالتَّثْبِيْتِ وَغَيْرِهٖ অর্থাৎ হাদীসের শব্দ قوله ثم اقيموا حول قبرى (অতঃপর তোমরা আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে) সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার ব্যপারে দুয়া করা এবং অন্যান্য ব্যাপারে দুআ করা। আর حتى استانس بكم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের দুআ, যিকির ও ইস্তেগফার দ্বারা তোমাদের সাথে ভালবাসা অর্জিত হবে। (মিরকাতঃ ৪/৮১)

এ প্রসঙ্গে মেরকাত শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ

وَقَدْ وَرَدَ فِى الْخَبَرِ لِاَبِىْ دَاؤُدَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ اِسْتَغْفِرُوْا اللهَ لِاَخِيْكُمْ وَاسْئَلُوْا لَهٗ اَلتَّثْبِيْتَ فَاِنَّهٗ اَلْاٰنَ يُسْئَلُ. مرقات، ٤/٨١)

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, দাফনের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ ও এস্তেগফার কামনা করা সুন্নত। তবে সেক্ষেত্রে শালিনতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। দুয়ার সময় তা যেন চিৎকারে রূপ না নেয়। অনুরূপভাবে দাফনের পরে মৃত্যু ব্যক্তির ঘরে ইসালে সওয়াবের আসর করা বিদ'আত। মারাকিউল ফালাহ্ নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

قَالَ كَثِيْرٌ مِّنْ مُتَاَخِّرِى اَئِمَّتِنَا رَحِمَهُمُ اللهُ يَكْرَهُ الْاِجْمَاعُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمَيِّتِ حَتّٰى يَأْتِىْ إِلَيْهِ مَن يَّعْزِىْ بَلْ اِذَا رَجَعَ مِنَ الدفنِ فَلْيَتَفَرَّقُوْا وَ يَشْتَغِلُوا بِاُمُوْرِهِمْ وَ صَاحِبُ الْمَيِّتِ بِاَمْرِهٖ.

সমবেদনা প্রকাশের জন্য মৃত ব্যক্তির ঘরে একত্রিত হওয়া মাকরুহ। বরং দাফনের পর সকলে পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ কর্মে গমন করবে। মৃত ব্যক্তির আপন জনেরা তাদের প্রয়োজনীয় কাজে লেগে যাবে।(মারাকিউল ফালাহঃ ১২০,শামী ১/৮৪২)

ইসালে সওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

কুরআন খতম করে বা কুরআনের বিভিন্ন অংশ ও সূরার পাঠ করে, নফল নামাজ ও দান-খয়রাত করে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করবে। এবাপারে স্বামী গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছেঃ

وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ إِلَى الْمُفْلِحُوْنَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ أٰمَنَ الرَّسُوْلِ وَ سُوْرَةُ يٰسٓ و تَبَارَكَ الْمُلْكُ وسُوْرَةُ التَّكَاثُرِ وَالْاِخْلَاصِ اِثْنٰى عَشَرَ مَرَّةً اَوْ اِحْدٰى عَشَرَ اَوْ سَبْعًا اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَوْ صِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ إِلٰى فُلَانٍ اَوْ اِلَيْهِمْ. (شامى، ١/٨٤٤)

কুরআন হতে যা পাঠ করেত সহজ তা পাঠ করবে (যেমন) সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার প্রথম দিকের আয়াতগুলো মুফলিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল করুসী, আমানার রাসুল, সূরা ইয়াসীন, সূরা মূলক, সূরা তাকাসূর এবং সূরা এখলাছ বারো বার অথবা সাত বার অথবা তিনবার পাঠ করবে। অতপর বলবে হে আল্লাহ ! আমরা যা পড়েছি এর সওয়াব অমুক ব্যক্তির অথবা ব্যক্তিবর্গের নিকট পৌছে দাও।

(শামীঃ ১/৮৪২)

ফাতওয়ায়ে আলমগীরিতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَاتِحَةِ وَ اٰيَةَ الْكُرْسِى ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةَ اِذَا زُلْزِلَتْ وَ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ كَذَا فِى الْغَرَائِبِ. فتاوى عالمغير: ٥/٣٩٤، باب الكراهية)

(কবর খানাতে প্রবেশ করে মাসনূন দুআসমূহ পড়ে নিবে) অতপর সূরা ফাতিহা, আয়াতাল কুরসী, সূরা ইজাযুল যিলাহ, আল হাকুমুত্তাকাসূর পড়বে।

(আলমগীরীঃ ৫/৩৯৪)

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে বর্ণিত হয়েছেঃ

؛اخرج ابو القاسم سعد بن على الزنجانى فى فؤائده عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد و الهكم التكاثر ثم قال انى جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لاهل المقابر من المؤمنين والمنؤمنات كانوا شفعاءله إلى الله تعالى.

আবুল কাসেম সায়াদ বিন আলি আয যুনজানি তার ফাওয়ায়েদ কিতাবে আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবর স্থানে প্রবশে করে সূরা ফাতিহা, সূরা এখলাস এবং সূরা তাকাসুর পাঠ করে বলে, হে আল্লাহ আমি তোমার কালাম পাঠ করেছিএতে যা কিছু সওয়াব দান করে থাক তা এই কবরের মুসলমান নারী-পুরুষদের জন্য দিয়ে দিলাম এতে তারা তার জন্য সুপারিশ কারী হবে। (দারে কুতনী)

এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখযোগ্যঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ إِحْدٰى عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ اُعْطِيَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ. دار قطنى

নিশ্চয় রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কবর স্হনে যাবে এবং ১১ বার সূরা এখলাছ পাঠ করে তার সওয়াব মৃত বাক্তিদেরকে বখশিয়ে দিবে, (মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনুযায়ী সওয়াব তাকে প্রদান করা হবে।

(দারে কুত্বনী, ফাতওয়ায়ে রহিমিয়াঃ ৫/১২৫)

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেন, আমি কবরে উপস্হিত হলে নিম্ন বর্ণিত দুয়াটি পাঠ করি।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْاَثَرِ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَجْمَعِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ـ

অতপর ৩ বার দরুদ শরীফ, ৩ বার সূরা ফাতিহা, ৩ বার এখলাছ, আবার ৩ বার দরূদ পাঠ করি এর পর সমস্ত মৃত বাক্তিদের মাগফেরাতের জন্য দুআ করি। (ফরমুদাতে হযরত মাদানীঃ ৫/১২৫)

মুসলিম সমাজে প্রচলিত শির্ক ও কুফর

শির্ক ও কুফর মারাত্মক অপরাধ। কথা ও কাজে যেন তা প্রকাশ না পায় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। অথচ ক'থায় ক'থায় ও বিভিন্ন কাজে আমরা এমন কিছু প্রকাশ করে থাকি যা হয় শির্ক অথবা কুফ্রের অন্তর্ভূক্ত। অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে এ থেকে তৌবা করা হয় না। নিম্নে এমন কিছু কুফর ও শিরকের বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

কুফরী কাজ পছন্দ করা, কুফরী কাজ ও ক'থাকে ভাল মনে করা, অন্যকে দিয়ে কুফরী কাজ করানো বা কথা বলানো, মুসলমান হওয়ার উপর অক্ষেপ করে এমন কথা বলা যে, মুসলমান না হয়ে অন্য জাতি হলে আমার উন্নতি হতো, প্রিয়জন মারা গেলে আল্লাহ্ কে গালি দিয়ে এমন বলা যে, অন্য কাউকে পায়না, আমার ------- কে নিয়ে গেলো ইত্যাদি এসব কুফ্রী কাজের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহ ও তার রসূলের কোন কাজ কে খারাপ ধারণা করা এবং তাতে দোষ ধরা, নবী-ফেরেস্তাদের দোষারোপ করা, তাদেরকে তুচ্ছ ও ঘৃণা করা, পীর বা বুজুর্গ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা যে, তিনি আমাদের মনের কথা জানেন বা তিনি ব্যবসায় লাভ লোসকানের ব্যবস্থা করতে পারেন, হাত দেখায়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট মনের বাসনা কামনা করা অথবা সন্তান চাওয়া, কারো নামে রোজা রাখা বা পশু জবেহ করা, দরগাহে মান্নত করা, পীরের ঘর প্রদক্ষিণ করা, আল্লাহ ও তার সূলের নির্দেশের উপর অন্যের নির্দেশ কে প্রাধান্য দেওয়া, কারো সম্মানে মস্তক অবনত করা বা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা, কাবা ঘরের ন্যায় অন্য কোন স্থানকে সম্মান করা, কারো নামে ছেলে-মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা, কারো নামে গলাতে পয়সা বা সুতা বাধা, বরের মাথায় ফুলের মালা বাধা ইত্যাদি সবই শির্ক ও কুফরের অন্তর্ভূক্ত।

মীলাদ ও কিয়াম প্রসঙ্গ

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন ব্যস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। কাজেই ইসলাম যে কাজকে বৈধ বা হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছে তা-ই কেবল বৈধ ও হালাল এবং তা নিঃসন্দেহে পূণ্যের কাজ। এ ছাড়া আর যা সব অবৈধ ও হারাম এবং পাপের কাজ। প্রথম প্রকারের কাজে রয়ছে প্রতিদান; আর শেষ প্রকারের কাজে রয়েছে শাস্তি।

ইসলামের বিধি-বিধানের মূল উৎস দুটি। কুরআন ও হাদীস। এদুটি প্রধান দলীল। এ ছাড়াও রয়েছে আরো দুটি দলীল। একটি ইজমা বা উম্মতের ঐক্যমত। অন্যটি কিয়াস বা কুরআন হাদীসের আলোকে কিছু বের করা। এই চারটি দলীলের ভিত্তিতে যা ইবাদত ও হালাল-হারাম বলে ঘোষিত তাই ইসলামের বিধান। এর অতিরিক্ত কিছু শরীয়তের বিধান মনে করে করা গোনাহের কাজ। শরীয়তের পরিভাষায় এধরণের কাজকে বিদ'আত বলে যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান সমাজে যে সব বিদ'আত প্রচলিত রয়েছে তা দু ধরণের। এক. মৌলিক বিদ'আত। দুই. পদ্ধতিগত বিদ'আত। যে বিদ'আতে পদ্ধতি ও মৌলিক নব উদ্ভাবিত তা-ই মৌলিক বিদ'আত বলে খ্যাত। যেমন মাযার কেন্দ্রীক ওরস। আর যে বিদ'আতের মৌল কাজটি শরীয়ত সম্মত ইবাদত কিন্তু পদ্ধতিটি সুন্নতের পরিপন্থী তা পদ্ধতিগত বিদ'আত। যেমন প্রচলিত মিলাদ এবং মিলাদে ইয়া নবী সালামু আলাইকুম বলে দাঁড়ান। এ মিলাদের মৌলিক কাজ হলো নবীর উপর দরূদ পাঠান। এটি একটি পুণ্যময় ইবাদত। দরূদ পাঠ করলে হুজুরের শাফায়াত লাভ হবে। একবার পাঠ করলে দশটি রহমত বর্ষিত হবে। পবিত্র কুরআনে দরূদ পাঠের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এজন্য জীবনে অন্তত একবার দরূদ পাঠ করা ফরজ। অনুরূপভাবে নবীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করাও পুণ্যের কাজ। কিন্তু মীলাদ অনুষ্ঠানের নামে কিছু কবিতা ও দরূদ পাঠের সম্মিলিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইসলাম সম্মত নয়। কেননা এরূপ অনুষ্ঠান কুরাআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দলীলে পাওয়া যায় না। তাই এটি সম্পূর্ণ নব আবিষ্কৃত বিষয়; যা পালন করা বিদ'আত। কাজেই এধরণের মীলাদ পরিত্যাজ্য।

মীলাদের উৎপত্তিঃ

প্রচলিত মীলাদের প্রবর্তক হলেন, ইরাকের মুসল শহরের শাসন কর্তা মুজাফ্ফর উদ্দীন কৌকুরী। মূলত তার নির্দেশে আবুল খাত্তাব উমর নামাক জনৈক আলেম

৬০৪ সালে এর প্রচলন করেন। ইনি ইবনে দাহ্ইয়া নামে সমাধিক পরিচিত। এদের চরিত্র তেমন ভাল ছিল না। সুলতান মুজাফফার ছিলেন একজ অপব্যয়ী শাসক। রাষ্ট্রীয় অর্থ তিনি সীমাহীনভাবে খরচ করতেন। এই মীলাদ অনুষ্ঠান উৎযাপন, এবং তার প্রসার ও প্রচলনে অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক যাহাবী বলেনঃ

> তার মীলাদ মাহফিলের কাহিনী ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। মীলাদ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে ও আল জিরিয়া হতে লোকের আগমন ঘটত। মীলাদের দিন তার ও তার স্ত্রীর জন্য সুরোম্য কাঠের গম্বুজাকৃতির তাঁবু তৈরি করা হতো। সেখানে গান-বাজনা ও খেলা-ধূলার আসর জমত। মুজাফফর প্রত্যহ আসরের পরে সেখানে আসনেত এবং অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। অনুষ্ঠান দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ চলতো। অসংখ্য পশু জবেহ করে আগত ব্যক্তিদের আহারের ব্যবস্থা করা হত। তিনি এ উপলক্ষে তিন লাখ দীনার বাজেট পেশ করতেন। ফকীর-দরবেশদের জন্য দুলাখ এবং অতিথিশালার মেহমানদের জন্য একলাখ দীনার। একজন জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন, আমি দস্তর খানায় বিশেষ প্রজাতির একশত ঘোড়া, পাঁচ হাজার বকরীর মাথা, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ্য গামলা এবং তিন হাজার হালুয়া পাত্র গণনা করেছি। ---- এরপর ইমাম যাহাবী মন্তব্য করেন, বিষয়টি আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কারণ এর দশ ভাগের এক ভাগও এর বেশি।

এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন মোহাম্মদ মিসরী বলেনঃ

> তিনি বাদশা ছিলেন। সমকালীন উলামাদেরকে তিনি স্ব স্ব ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ প্রদান করে ছিলেন। ইমামদের অনুসরণ করতে নিষেধ করতেন। ফলে এক শ্রেণীর আলেম সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। তিনি রবিউল আওয়াল মাসে মীলাদ শরীফের আয়োজন করতেন। তিনিই প্রথম বাদশা যিদি মীলাদের প্রবর্তন করেন। (আল মিনহাজুল ওয়াজিহঃ ১৬২)

অতএব বুঝা গেল প্রচলিত মীলাদের প্রবর্তক বাদশা মুজাফ্ফার ইসলামী বিধি-বিধানের গুরুত্ব দিতেন না। গান-বাজনায় লিপ্ত হতেন। ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে মীলাদের আয়োজন করতেন। আলেমদেরকে প্রলোভনের মাধ্যমে ইচ্ছে মত ব্যবহার করতেন। এক শ্রেণীর আলেম তার প্রলোভনে পা দিয়ে তার তাবেদারী করত।

অন্য দিকে যে আলেম প্রচলিত মীলাদ প্রবর্তনে সহায়তা দান করেছিলেন তার [illegible] মাজদুদ্দীন আবুল খাত্তাব উমর বিন হাসান বিন আলী বিম জমায়েল। তিনি [illegible]কে

প্রসিদ্ধ সাহাবী দাহ্ইয়াতুল কালবী-এর বংশধর বলে দাবী করতেন। অথচ তা ছিল মিথ্যা দাবী। কারণ দাহইয়াতুল কালবী (র.) এর কোন উত্তরসূরী ছিল না। তাছাড়া তাঁর বংশ ধারায় মধ্যস্তন পুর্বপুরুষরা ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। তারপরও তার বর্ণিত বংশ ধারায় অনেক পুরুষের উল্লেখ নাই। (মিযানুল ইতিদালঃ ১/১৮৬) এই সরকারী দরবারী আলেম একটি পুস্তক রচনা করেন। তার নাম التنوير فى مولد لسيراج المنير। এই পুস্তকে মীলাদের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়। ৬০৪ হিজরীতে শাসক মুজাফ্ফার কে পুস্তকটি উপহার দেন। এতে তিনি খুশি হয়ে তাকে দশ হাজার দীনার বখশিশ দেন। আর সে বছর হতেই তিনি মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। (টীকাঃ সিয়ারু আলা মিননুবালাঃ ১৫/২৭৪)

একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন ব্যক্তি হতে যদিও তিনি ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ প্রকাশ পেলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই এমন দুজন ব্যক্তি হতে প্রচলিত মীলাদ আবিস্কৃত হয়েছে, যাদের চরিত্র গ্রহণযোগ্য নয়, তা কখনো শরীয়তে ইবাদত বলে পরিগণিত হতে পারে না।

মীলাদ প্রথা আবিস্কারের পরে সে যুগের মানুষ বছরে একটি দিনে (১২ রবিউল আউয়াল) তা পালন করতো এবং তা কয়েকদিন ধরে চলত। পরবর্তীতে ভক্তরা এটিকে সওয়াবের কাজ মনে করে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে পালন করতে শুরু করে। আগে বড় ধরণের মাহ্ফিলের আয়োজন হত। বর্তমানে যত্র তত্র তা পালন করা হচ্ছে। সে যুগে মহা নবীর জীবনী নিয়ে আলোচনা হতো। বর্তমানে মনগড়া কিছু দরূদ ও গজল গেয়ে শেষ করা হয়। তেমন কোন আলোচনা করা হয় না। তাই বলা যায় পুর্ব যুগের মীলাদ এযুগে কোন কোন দিক দিয়ে ব্যাপকতা লাভ করলেও মূল দিক হতে সংকীর্ণতা রূপ ধারণ করেছে।

প্রচলিত এ মীলাদ কেন বিদ'আত? সাধাণরভাবে এপ্রশ্নটি মনে ধাক্কা দিতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যা শরীয়তের চার দলীল দ্বারা প্রমানিত নয় তাকে শরীয়তের বিধান মনে করে করাকে বিদআত বলে। যেহেতু প্রচলিত এই মীলাদ চার দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাই তা বিদআত। তা ছাড়া জন্মদিন পালন করা বিজাতীয় সংস্কৃতি। যেমন খ্রস্টানরা ঈসা-(আ.) এর, হিন্দুরা শ্রী কৃষ্ণের জন্ম দিন পালন করে। তাই মহানবীর জন্ম দিন পালন করা বিজাতীয় সংস্কৃতির অংগ। তাই এ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। অনুরূপভাবে সম্মিলিতভাবে দরূদ পাঠের আয়োজন করাও বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত।

মহানবীর জীবনী আলোচনা করা, তাঁর মহান আদর্শের কথা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা কোন দোষণীয় নয়। বরং এটি বড় ধরণের তাবলীগ। কিন্তু তার জন্য বছরের একটি দিনকে নির্ধারণ করা বা সে দিনে এ ধরণের আলোচনা ফযিলাত পূর্ণ মনে করা ঠিক নয়। তাই ভাল বিষয় হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত মীলাদ বিশেষ কয়েকটি কারণে বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। যথা-

ক. রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ তার জন্য নির্ধারণ করা।

খ. দরূদ পাঠের জন্য নির্দিষ্টি পদ্ধতিকে জরুরী মনে করা।

গ. হুজুরের আত্মা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্হিত হয়েছে মনে করে দাঁড়ান। ইত্যাদি।

ক্বিয়ামঃ

প্রচলিত মীলাদের সাথে আর একটি প্রথা সংযোযিত হয়ছে। তা হলো রসূল (স.) এর সম্মানার্থে দাঁড়ান। এটি মৌলিক বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। সম্পূর্ণ অপ্রাসাঙ্গি একটি বিষয় মীলাদের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এটি মীলাদের পরে আবিস্কৃত হয়েছে।

উৎপত্তিঃ

৭৫১ হিজরীর কথা। খাজা তকীউদ্দীন ছিলেন একজন ভাব কবি ও মাজযুব (ভাবাবেগে উদ্দেলিত) ব্যক্তি। মহানবী (স.) এর নামে তিনি বিভিন্ন কাসিদা রচনা করেন। বরাবরের ন্যায় একদিন তিনি কাসিদা পাঠ করছিলেন। বসা থেকে ভাবাবেগে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে কাসিদা পাঠ করতে থাকলেন। ভক্তারও তার দেখা দেখি দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাস, ঘটনা এখানেই শেষ। তিনি আর কখনো এমনটি করেন নি।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, খাজা তকীউদ্দীন কবিতা পাঠ করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এটি কোন মীলাদের অনুষ্ঠান ছিল না। তিনি অনিচ্ছাকৃত দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মীলাদের জন্মের একশত বছর পরে বিদআতপন্থীরা এটিকে মীলাদের সাথে জুড়ে দেয়। ফলে ক্বিয়াম বিশিষ্ট মীলাদ বিদআত হওয়ার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বস্তুত আমাদের দেশে এমন অনেক বিদ'আত রয়েছে যা বুজুর্গদের বিশেষ মূহুর্তের আমল থেকে সৃষ্ট। সংশ্লিষ্ট বুজর্গ কখনো তার ভক্তদের এসব করার নির্দেশ দেননি, অনুসারীরা অজ্ঞতা কিংবা স্বার্থান্ধতা বশতঃ এসব কাজ চালু করেছে।

মহানবী (স.) এর অদৃশ্যের খবর জানা প্রসঙ্গে

প্রচলিত মীলাদের সাথে বিদআত পন্থীরা আরও একটি মহা অপরাধের কাজ চালু রাখার ব্যাপারে তৎপর রয়েছে। তা হলো তারা বিশ্বাস করে এবং অন্যদেরকে বলে থাকে, মীলাদ অনুষ্ঠানে নাকি মহানবী (স.) স্বয়ং উপস্থিত হন। (নাউজু বিল্লাহ)। অর্থাৎ তারা মহানবীকে আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। আল্লাহ সর্ব দ্রষ্টা এবং সর্বত্র বিরাজমান। তারা মহানবীকেও সেরূপ মনে করে। অথচ এ গুণ কোন সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নেই। এটি আল্লাহর সিফাতের সাথে তাকে শরীক করার নামান্তর। এ কারণে দুররে মুখতার নামক কিতাবে বলা হয়েছে, যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলকে সাক্ষ রেখে বিবাহ করে, তবে তা বিশুদ্ধ হবে না। বরং অনেকের মতে কাফের হয়ে যাবে। (দুররে মুখতারঃ ৩/২৭) কারণ এখানে মহানবীকে উপস্থিত মনে করেছে যা করা কুফরী কাজ। পবিত্র কুরআনে নবীদের সম্পকে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য বলা হয়েছেঃ

قُلْ لَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى إِلَيَّ.

হে নবী, বলুন আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত নই। আমি এমনও বলিনা যে, আমি ফেরেস্তা। আমি সেই ওহীর অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে।

(সূরা আনআমঃ ৫০)

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ.

তিনিই অদৃশ্য বিষয় এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বাজ্ঞ।

(আনআমঃ ৭৩)

দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কেউ এ জ্ঞানের অধিকারী নয়। এ সংক্রান্ত কুরআন মাজীদে ৩০টিরও অধিক আয়াত এসেছে। সে ক্ষেত্রে একজন নবীর পক্ষে সর্বজ্ঞ হওয়া অসম্ভব একটি বিষয়। কাজেই তার জন্য পৃথিবীর যে কোন স্থানে উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস অবান্তর অলীক বই কিছু নয়।

মানুষ জ্ঞান রাখে বটে, তবে সর্বজ্ঞ নয়। এ বিষয়টি একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত। আর রাসূল নবী হলেও তিনি মানুষ ছিলেন। মানুষ হিসেবেই তিনি জীবন

যাপন করেছেন। মানুষের সকল বৈশিষ্টই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মানুষের মতই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। আর মৃত ব্যাক্তি কখনো স্বশরীরে উপস্থিত হয় না। কাজেই কুরআন ও হাদীসের আলোকে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, রাসূলে করীম (স.) কোন মীলাদ মাহফিলে স্বশরীরে উপস্থিত হন না। তাছাড়া হাদীস হতে প্রমাণিত যে, কেউ কোথাও হতে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করলে তা তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىْ السَّلَامَ (رواه النسائ و الدارمى ، مشكوة ، ٨٦)

রসূল (স.) বলেন, আল্লাহর তফর হতে কিছু ফেরেস্তা বিশ্বময় ভ্রমণ করে বেড়ায় এবং আমার উম্মতের সালাম (কেউ কোথাও দরূদ ও সালাম পাঠ করলে) আমার নিকট পৌঁছে দেয়। (নাসায়ীঃ ১/১৪৩, দারিমী, মিশতাকঃ ৮৬)

এ হাদীস সেই সমস্ত উম্মতের ক্ষেত্রে যারা তাঁর রওজা মুবারক হতে দূরে অবস্থান করছে। কিন্তু যারা তাঁর রওজার নিকট হতে দরূদ ও সালাম পাঠ করেন তিনি তা শুনতে পান এবং উত্তর প্রদান করেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ. (رواه البيهقى. مشكوات. ٨٧)

রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তা শুনতে পাই। আর যে দুর থেকে পাঠ করে আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। (বায়কাহী, মিশকতাঃ ৮৭)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে আরো একটি হাদীস এসেছে। তিনি বলেনঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ (رواه النسائى. مشكوة، ٨٦)

আমি রসূল (স.) হতে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের গৃহকে কবর বানিয়ো না। আর আমার কবরকে আনন্দ কেন্দ্রে পরিণত করো না। আমার উপর দরূদ পাঠ

করবে। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পোঁছে দেয়া হয় তোমরা যেখানেই থাক না কেন। (নাসায়ী, মিশকাতঃ ৮৬)

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (স.) কোথাও স্বশরীরে উপস্থিত হন না, বরং পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে যে কেউ তাঁর উপর দরূদ পাঠ করলে তা তাঁর নিকট পৌছে দেয়া হয়। কাজেই প্রচলিত এই মীলাদে তাঁর উপস্থিতি আবান্তর। সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের কাছে এর যৌক্তিকতা টেকে না। কেননা যদি ধরে নেয়া হয় তিনি মীলাদে উপস্থিভ হয়েছেন। তার অর্থ তিনি ইতোপূর্বে এখানে ছিলেন না। তবে কিভাবে তিনি সর্ব দ্রষ্টা ও সর্বত্র উপস্থিত থাকবেন। তার পরও যদি ধরে নেয়া হয় তিনি সর্বত্র বিরাজিত এবং সর্ব দ্রষ্টা, তাহলে নতুন করে তার উপস্থিত হওয়ার প্রশ্নই অসে না। তাছাড়া মীলাদে তাঁর উপস্থিতির কারণে যদি দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হয় তবে তো সর্বাবস্থায় দেখাতে হবে। কেননা তিনি যেহেতু সর্বত্র বিরাজিত, তা হলে আমাদের শোবার ঘরেও তো তিনি উপস্থিত। সেক্ষেত্রে সব কাজ ফেলে রেখে তো তাঁর সম্মানে দঁড়িয়ে থাকতে হবে। পরস্পর কথাবার্তা বলা এবং হাসি তামাশা করা সব কিছুই তাঁর আদবের পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে তাঁর সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না। আর তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথাবার্তা বল, তাঁর সাথে সেরূপ বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা অনুধাবন করতেও পারবে না। (সূরা হুজুরাতঃ ২)

উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা বলা যায় যে, হুজুর (স.) এর সামনে উচ্চ স্বরে কলা বলা হারাম। এতে আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। বিদআত পন্থী ভ্রাতাদের দাবী অনুযায়ী যদি রসূলে করীম (স.) কে হাজির-নাজির মনে করা হয় তা হলে মীলাদ, অমীলাদ, ওয়াজ-মাহফিল ইত্যাদিতে উচ্চস্বরে কলাবার্তা বলা বা হৈহুল্লোড় করা মারাত্মক দেয়াদবী। এমতাবস্থায় প্রচলিত মীলাদের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। কাজেই মহা নবী (স.) এর উপস্থিত হওয়ার যুক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও স্বরিরোধী দাবী। এমন দাবী করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, হুজুর (স.) জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর সম্মানে সাহাবীগণকে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু উমাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهٗ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

رواه ابو داؤد، مشكنة، ص ٤٠٣.

একদা রসূলুল্লাহ (স.) লাঠিতে ঠেস দিয়ে বের হলেন (আমাদের সামনে এলেন) আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা আজমী (অনারবী) লোকদের ন্যায় দাঁড়িও না। তারা এভাবে দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে। (আবু দাউদ, মিশকাতঃ ৪০৩)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, জীবদ্দশায় যেখানে তিনি তাঁর সম্মানে দাঁড়ানকে পছন্দ করেতন না, তখন ইন্তেকালের প'রে তিনি তা কি করে পছন্দ করবেন।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত অন্য আর একটি হাদিস এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كِرَاهِيَتِهٖ لِذٰلِكَ. رواه الترمذى، مشكوة ٤٠٣.

সাহাবায়ে কেরামের নিকটে রাসুল (স.) অপেক্ষা কোন ব্যক্তি অধিক প্রিয় ছিল না। অথচ তারা যখন তাকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন তিনি (রাসূল) এটি অপছন্দ করেন। (তিরমিজী, মেশকাতঃ ৪০৩ পৃ)

ক্বিয়াম যে বিদ'আত তা উপরের আলোচনা ছাড়াও উল্লিখিত হাদীস দুটির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন।

০০০

প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফতীগণের অভিমত

প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম যে কোন শরীয়তী কাজ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটি হাদীস-কুরআন, এজমা ও কিয়াস দ্বারাও প্রমানিত নয়। এ সম্পর্কে বিশ্ব বরেণ্য মুফতিগণ তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ক. আশ্‌শারআতুল ইলাহিয়্যা নামক গ্রন্থে আল্লামা আব্দুর রহমান মাগরিবী (রহ.) লিখেছেন, মীলাদ একটি বিদআত কাজ। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের কেউ এ কাজ করেন নি বা করতে বলেন নি।

খ. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন, শরীআতে এ বিষয়ে কোন আলোচনা নাই। (মিনহাজুল ওয়াজিহ)

গ. আহমদ বিন মুহাম্মদ মিশরী (রহ.) বলেন, চার মাযহাবের সকল উলামা এটি যে গর্হিত কাজ তার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (মিনহাজুল ওয়াজিহ)

ঘ. হযরত রশীদ আহমদ গুঙ্গীহি (রহ.) বলেন, মীলাদ মাহফিল সত্যের তিন যুগে ছিল না বিধায় তা বিদআত ও গর্হিত কাজ। (ফাতওয়ায়ে রাশিদিয়াঃ ১১৪)

ঙ. হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, রাসূলে করীম (স) এর জন্মের আলোচনার সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া (ক্বিয়াম করা) আল্লাহ না করুন কুফরী হয়ে যেতে পারে। (ইমাদাদুল ফাতওয়াঃ ৫/৩২৭ পৃ)

চ. পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতি মোঃ শফী (রহ.) বলেন, মীলাদ ও কিয়াম দুটোই না-জায়িজ। তবে প্রচলিত বিদআত ও প্রথা হতে মুক্ত হলে সীরাত অনুষ্ঠান জায়িজ। (ইমদাদুল মুফতিয়্যীনঃ ১৭৩পৃ)

ছ. বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা সারফরাজ খান সফদার (রহ.) বলেছেন, স্মরণ রাখতে হবে, মীলাদ মাহফিল এক জিনিস আর রসূলে করীম (স.) এর মুবারক জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা অন্য জিনিস। প্রথমটি বিদ'আত, আর দ্বিতীয়টি মুস্তাহাব।

(মিনহাজুল ওয়াজিহঃ ৭ রাহে সুন্নাহঃ)

শবে বারাত প্রসঙ্গে আলোচনা

আরবী শা 'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে শবে বারাত বলা হয়। আরবীতে এই রাত্র কে ليلة البرات و ليلة النصف من شعبان বলা হয়। তবে ভারত উপমহাদেশে এ রাতটি শবে বারাত নামে অধিক পরিচিত। ফার্সী ও আরবী শব্দের সমন্বয়ে শবে বারাত গঠিত। শব ফার্সী শব্দ, অর্থ রাত। আর বারাত আরবী শব্দ, অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তি। তবে বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের নিকট এটি ভাগ্য রজনী নামে পরিচিত।

উক্ত রাতের ফযিলাত সম্বলিত একটি বিশুদ্ধ হাদীসও কোন হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। তবে দুর্বল অথবা জালসূত্রে বর্ণিত নয়টি হাদীস নয়জন সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ৮টি হাদীসের বক্তব্য প্রায় একই রূপ। তা হলো, আল্লাহ শা'বান মাসের ১৫ তারিখ রাতে দুনিয়ার নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং অসংখ্য বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কোন বর্ণনায় এসেছে, ক্বাল্ব গোত্রের ছাগলসমূহের লোম পরিমাণ গুনাহ ও গেনাহগারকে ক্ষমা করে দেন।

(তিরমিজীঃ হাদিস নং- ৭৩৬, ইবনে মাজাঃ হাদিস নং-১৩৮৯)

আবার কোন কোন বর্ণনায় এরূপ এসেছে যে, আল্লাহ উক্ত রাতে দু শ্রেণীর বান্দা ছাড়া সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। তারা হলো মুশরিক এবং অপরের মাঝে বৈরীভাব পোষণকারী।

(ইবনে মাজাঃ হাদিস নং- ১০৯০, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমানঃ ১/২৮৮পৃ)

এই আটটি হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) হলেন, হযরত মুয়াজ, আবু ছালাবাতাল, খাশানী, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আবু মুসাল আশয়ারী, আবু হুরাইরা, আবু বকর ও আয়েশা (রা.)। এই হাদীসগুলোর সূত্র যদিও দুর্বল, কিন্তু দুর্বলতা কঠিন না হওয়ায় সবগুলোর সমন্বয়ে সহীহ অথবা হাসান হওয়ার দাবী রাখে; যার মাধ্যমে রাত্রিটির ফযিলাত সাব্যস্ত হয়।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাইমিয়া এ ব্যাপারে বলেনঃ

فَقَدْ رُوِىَ فِى فَضْلِهَا مِنَ الْاَحَادِيْثِ الْمَرْفُوْعَةِ وَالْاٰثَارِ مَا يُقْتَضِى اَنَّهَا لَيْلَةٌ مُفَضَّلَةٌ وَ قَدْ رُوِىَ بَعْضُ فَضَائِلِهَا فِى الْمَسَانِيْدِ وَالسُّنَنِ وَاِنْ كَانَ قَدْ وُضِعَ فِيْهَا اَشْيَاءُ آخَرُ(اقتضاء الصراط المستقيم ۔ ۳۰۲)

অর্ধ শাবানের রাত্রিটির ফযিলতের উপর বেশ কিছু মারফু হাদীস ও সহাবীদের আসর রয়েছে, যা প্রমান করে যে, রাত্রিটি ফযিলাতপুর্ণ ও বরকতময়। রাত্রিটির ফযিলাত সম্পর্কে মুসনাদ ও সুনান গ্রন্ত সমূহেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাত্রিটির ফযিলাত পূর্ণ হওয়ার সুযোগে তার মধ্যে অনেক কিছু নতুন বিষয় সংযোগ করা হয়েছে যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। (ইকতিয়া-উস ছিরাতিল মুসতাকীমঃ ৩০২ পৃ.)

অন্যদিকে তিরমিজী শরীফের নির্ভরযোগ্য ভাষ্য তুহফাতুল আহওয়াযীর প্রণেতা আবুল আলা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান (রহ.) স্বীয় রিওয়াইতগুলোর প্রায় সবকটির সমালোচনা করার পর বলেছেনঃ

فَهٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ بِمَجْمُوْعِهَا حُجَّةٌ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِى فَضِيْلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

(٣٦٧/٢)

এই হাদীসগুলো সমষ্টিগতভাবে ঐ ব্যক্তিদের বিপক্ষে প্রমানস্বরূপ যারা ধারণা করে যে, অর্ধ শাবানের রাতের ফযিলাতের ব্যাপারে কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। (২/৩৬৭)

হাফিজ ইবনে রাজাব (রহ.) তার লাতারেফুল মায়ারিফ নামক গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে,

وَفِى فَضْلِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اَحَادِثُ مُتَعَدِّدَةٌ وَ قَدْ اِخْتَلَفَ فِيْهَا فَضَعَّفَهَا الْاَكْثَرُوْنَ وَ صَحَّحَهُ اِبْنُ حَبَّان بَعْضَهَا وَ خَرَّجَهُ فِى صَحِيْحِهِ وَمِنْ اَمْثِلِهَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الـــخ (الصحيحة ١٣٨/٢)

অর্ধ শাবানের ফযিলাতের উপর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসগুলোতে মতানৈক্য রয়েছে: অধিকাংশ আলিমগণ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে হাববান ওই বর্ণনাগুলোর কোন কোনটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং স্বীয় **সহীস** গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। তার মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি অন্যতম। এ হাদীসে মহানবীর অনুপস্থিত থাকা এবং জান্নাতুল বাকীর দিকে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। (সিলসিলা ছহিহাঃ ২/১৩২)

একথা ঠিক যে, রাত্রিটির ফযিলাত সাব্যস্ত হলেও নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের বিষয় বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। তবে অন্য রাতের থেকে এরাতের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং বহু বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, এই হাদীসের উপর ভিত্তিকরে একথা ধরে নেওয়া যাবে না যে, আল্লাহ শুধুমাত্র এ রাতেই প্রথম আসমানে নেমে আসেন। বরং তিনি প্রতি রাতের শেষ ভাগে বা শেষ তৃতীয়াংশে নেমে আসেন এ সংক্রান্ত হাদীসটি মোতাওয়াতির (অংস্য বর্ণনাকারী) থেকে বর্ণিত হয়েছে। মোট আটাশজন সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْـهُ عَـنِ النَّبِـىِّ صَلَّـى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَـةٍ إِلٰى سَمَـاءِ الدُّنْيَـا حِـيْنَ يَبْقَـى ثُلُثَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَـهُ وَمَنْ يَسْـأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ متفق عليه

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (স.) বলেছেন, আমাদের প্রতিপ্রালক প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্টের সময় দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেত থাকেন, কে আমার নিকট দুআ করবে আমি তার দুআ গ্রহণ করবো। কে আমার নিকট কিছু চাইবে, আমি তাকে তা প্রদান করবো, কে আমার নিকট ক্ষমা চাইব আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (বুখারী ও মুসলিম)

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের নির্ধারিত আক্বীদা হলো যে, আল্লাহ প্রকৃতভাবে আরশে সমুন্নত এবং প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার নিকটস্হ আসমানে নেমে আসেন এবং ফজর পর্যন্ত অবস্হান করেন। বিষয়টি বাস্তবেই ঘটে; রূপকভাবে নয়। এটিই পুর্ববর্তী ওলামাদের মাযহাব।

আল্লাহ তার গুণে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। তিনি পৃথিবীর সকল কিছুর উর্ধে। তার ক্ষেত্রে কোন উপমা, তুলনা ও প্রতিদন্দ্বিতা করা অবান্তর। কারণ ليس كمثله شيئ و هو السميع البصير (তার সাদৃশ্য কোন কিছুই নেই। তিনি শ্রবণ ও দর্শনকারী) অর্থাৎ তিনি প্রকৃতভাবে শ্রবন করেন ও দর্শন করেন, কিন্তু তা কোন সৃষ্টির শ্রবন ও দর্শনের মত নয়। অনুরূপভাবে তিনি ধরেন, বিচরণ করেন, অবতরণ করেন, আহবান ইত্যাদি করেন; কিন্তু তা সৃষ্টির কোন ধরণ, বিচরণ, অবতরণ ও

আহবানের ন্যায় নয়। অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানী এই মানব জাতিকে তাঁর বিশালত্ব বুঝানোর জন্যই এইরূপ শব্দের অবতারণা করা হয়েছে মাত্র। কাজেই এ ক্ষেত্রে আর কোন সংসয় ও প্রশ্নের অবতারণা থাকে না। তার পরও কিছু প্রশ্ন এসে যায়। যেমন তিনি যদি রাতের শেষ ভাগে আমাদের দেশের প্রথম আসমানে অবতরণ করেন, তখন ঐ সময় তো অন্য দেশে রাত্র দ্বিপ্রহর বা রাতের শুরু বা সন্ধ্যা বা দ্বিপ্রহর বা সকাল। তাহলে বিশ্ববাসী কিভাবে এই সুবিধা লাভে ধন্য হবে। না তিনি এক এক করে রাতের শেষ ভাগে এক এক দেশের আসমানে যান ? তাই যদি হয় তবে সূরা ত্বহার ৫ নং আয়াতে (الرحمن على العرش الاستوى) তাঁর আরশে সমুন্নত থাকার বিষয়টি কেমন ঘোলাটে হয়ে যায়।

প্রথম কথা আল্লাহ যে সকল বিষয়ের উপর সর্ব শক্তিমান তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। এর পরে এ কথা বলা যাবে যে, তার মহাপরাক্রমতার কাছে কোন কিছুর তুলনা হয় না। ক্ষুদ্র জ্ঞানী দূর্বল মানুষের বোধগম্যের জন্য আল্লাহ এরূপ কিছু উপমার অবতারণা করেছেন মাত্র; যার বিশালত্ব বোধগম্য সৃষ্টি জীবের ক্ষুদ্রজ্ঞানে অনুধাবন অসম্ভব। কেননা তার বিশালত্ব ও ক্ষমতার অনুমান আমাদের জ্ঞান ও বিবেকের অনেক দুরে। তিনি যা করতে পারেন আমরা তা কল্পণাও করতে পারি না। কাজেই এ বিষয়ে ব্যাপক প্রশ্ন করা পথ ভ্রষ্ঠতা। হযরত ওমর (রা.) এরূপ প্রশ্নকারীকে বেত্রাঘাত করতেন এবং জেল খানায় প্রেরণ করতেন এবং মানুষের সংশ্রব হতে তাকে দূরে রাখতেন। (ইযালাতুল খাফা)

এ ব্যাপারে ধারণার সুস্পষ্টতার জন্য আরো কিছু উদ্ধৃতি বর্ণনা করা হলোঃ

رُوِىَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَالْاِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ وَالْحَسَنِ وَ أَبِى حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ اَنَّ الْاِسْتِوَاءَ مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفَ مَجْهُوْلٌ وَالْاِيْمَانَ بِهٖ وَاجِبٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَ رُوِىَ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ اَنَّ اللّٰهَ فِى السَّمٰوَاتِ دُوْنَ الْاَرْضِ وَعَنْهُ وَقَالَ مَنْ اَنْكَرَ اللّٰهَ فِى السَّمَاءِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى عَرْشِهٖ فِى سَمَائِهَا يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهٖ كَيْفَ شَاءَ وَيَنْزِلُ كَيْفَ شَاءَ وَ مِثْلُ ذٰلِكَ قَالَ اَحْمَدُ وَقَالَ اِسْحٰقُ اِنَّهٗ اَجْمَعَ اَهْلُ الْعِلْمِ اَنَّهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ اِسْتَوٰى وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْئٍ وَهُوَ قَوْلُ الْمُزَنِى وَالْبُخَارِىُّ وَاَبِىْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىِّ وَابْنُ مَاجَةَ وابى يعلى والبيهقى وغيرهم من ائمة الحديث (حاشية جلالين ـ ١٣٤)

হযরত উম্মে সালমা (রা.) , ইমাম জাফর সাদেক, হাসান, আবু হানিফা, ইমাম মালেক (রহ.) প্রমুখ ইমামগণ (আল্লাহর আরশে আজীমে উপবিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে) বলেন, আল্লাহ তাআলার আরশে উপবিষ্ট হওয়াটা নিশ্চিত। (কিন্তু) তবে তাঁর উপবিষ্টের ধরণ ও পদ্ধতি জানা নেই। আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট আছে এর উপর বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক। তবে উপবিষ্টের ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত। ইমাম বায়হাকী আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানে অবস্থান করেন, যমীনে নয়। তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ আসমানে আছেন এই কথাকে যে অস্বীকার করবে সে কাফের হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলা আসমানে স্বীয় আরশে উপবিষ্ট আছেন। তিনি সৃষ্টির নিকটবর্তি যে কোন পদ্ধতিতে হতে পারে এবং তিনি যে কোন পদ্ধতিতে আরশ হতে অবতরণ করতে সক্ষম। ইমাম আহমদ (রহ) এর মতও এটি। ইসহাক বলেন, ধর্মীয় পন্ডিতগণ এ কথার উপর একমত যে, আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট এবং সর্বজ্ঞ। এটিই বুখারী, মুজনী, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা, আবি ইয়ালা, বায়হাকী প্রমুখ হাদীস বিশারদদের রায়। (জালালাইন শরীফের টিকাঃ ১৩৪ পৃ.)

প্রচলিত শবে বারাতের ইতিহাস

শাবান মাসের ১৪ তারিখ এর রাত্রটি শবে বারাত নামে খ্যাত। এ রাতকে কেন্দ্র করে নানাবিধ প্রথা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। অনেক মনগড়া ইবাদত বন্দেগীর পদ্ধতিও চালু কার হয়েছে। সে সবের প্রমাণে জাল হাদীসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সে সমস্ত প্রথার মধ্যে একটি হলো সূর্যাস্তের পর গোসল করে ১০০ রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করা। কোন কোন এলাকাতে আবার ১২ রাকাত নফল নামাজ জামায়াতের সাথে আদায়ের প্রথাও চালু আছে। এক্ষেত্রে কোন রাকাতে কোন সূরা পাঠ করতে হবে তাও নির্ধারণ রয়েছে। অথচ এসবের কোন প্রমাণ রাসূল (স.), সাহাবা আজমাইন, তাবেয়ীনদের থেকে পাওয়া যায় না।

প্রচলিত শবে বারাতের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, ৪৪৮ হিজরী সনে বাইতুল মাকদাসে সর্ব প্রথম এই নামাজের প্রচলন ঘটানো হয় যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

আল্লামা ইবনে রাজীব লাতায়েফুল মায়ারিফ নামক কিতাবে লিখেছেন, শাম দেশে (সিরিয়া) অবস্থানরত তাবেই খালেদ বিন মায়াদান, মাকহুল ও লুকমান বিন আমির প্রমুখ এই রাতে ইবাদত করতেন। তাঁদের দেখাদেখি অনেকেই তা করতে শুরু করে। বলা হয়ে থাকে যে, তাদের নিকট এর স্বপক্ষে ইহুদিদের বানানো হাদীস পৌছেছিল। এরই ভিত্তিতে তারা ইবাদত করতেন। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে শুরু করে। এদের মধ্যে বসরার আলেমগণও ছিলেন। কিন্তু হিজাজের তাবেয়ীগণ এর প্রতিবাদ করতে থাকেন। এদের মধ্যে আত্বা ও ইবনু আবি মুলায়কা এর নাম প্রসিদ্ধ। আব্দুর রহমান বিন যায়েদ মদীনার আইনদিবদের থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে ইমাম মালেকও আছেন। তাদের মতে ঐ রাতে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে যে সব মনগড়া ইবাদত করা হচ্ছে তা বিদ'আত।

তবে কতিপয় তাবেয়ী হতে এরাত্র জাগরণের প্রচলন হলেও তাতে কোন আড়ম্বরতা সামষ্টিক রূপ ছিল না। পরবর্তীতে তা মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায়ের রূপ ধারণ করেছে। ৪৪৮ হিজরীতে ইবনু হুমাইরা নামক এক ব্যক্তি এর প্রচলন শুরু করে। তার গলার সুর ছিল সুমিষ্ট। সে নাবলুস শহর থেকে বাইতুল মাকদাসে এসে ছিল। সে বাইতুল মাকদাস মসজিদে শবে বারাতের রাতে উচ্চ স্বরে নামাজ শুরু করেছিল। তার মিষ্টি সূরে আকৃষ্ট হয়ে এক এক করে অনেক লোক তার সাথে যোগ দিতে শুরু করে। ফলে বেশ বড় ধরণের এক জামাতে পরিণত হয়। ফলে সে পরবর্তী বছরেও অনুরূপ নামাজ শুরু করে। এ বছর আরো অধিক সংখ্যক লোক তার পিছনে শরীক হয়। এর দেখাদেখি অন্য মসজিদেও এর প্রচলন শুরু হয়ে যায়। এ ভাবেই এ প্রথাটি স্থায়িত্ব লাভ করে এবং বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশেও এ প্রথার প্রচলন ঘটে।

মাকদ'সী বলেন, এ প্রথা যিনি চালু করেন কিছু দিন পরে তিনিই এর চর্চা ছেড়ে দেন। তাকে এটি ছাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে তিনি বলেন, এ প্রথা চালু করার জন্যআমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। (الامر بالاتباع والنهي عن الابتداء. علامة جلال الدين السيوطي. ص ١٣٦-٢٣٤)

শবে বারাতকে কেন্দ্র করে বিদআতঃ

শবে বারাতকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে অনেক বিদআতের প্রচলন রয়েছে। অনেকে সূর্যাস্তের পর গোসল করে সালাতে আলফিয়া ও সালাতে রাগায়িব নামক নামাজ আদায় করে থাকেন। শরীয়তে এর কোন প্রমান নেই। কাজেই এটি বিদআত। তাছাড়া আতশবাজি ও আলোকসজ্জা করা, বরকতের আশায় হালুয়া-রুটি বিতরণ, নারী-পুরুষের সম্মিলিতভাবে কবরস্থানে গমন, কবরবাসীদেরকে সম্বোধন করে ফরিয়াদ জ্ঞাপন, সেখানে বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজ বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। অনেকে এরাতে পীর-আউলিয়াদের কবরে মাল্যদান ও ফরিয়াদ করে থাকে, যা অনেকটা শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

বলাবাহুল্য এসমস্ত কাজ অনেকে নেকীর আশায় করছে। অথচ অজ্ঞতার কারণে তারা নেকী তো দূরের কথা বরং শুধুমাত্র গোমরাহীর পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং গোনাহের বোঝা বাড়াচ্ছে। অচথ রসূলে করীম (স.) সতর্ক করে করে কয়েক শ্রেণীর মানুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَ الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهِمَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের উপর রসুল (স.) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে সমস্ত লোকদের প্রতিও যারা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করে ও বাতি জ্বালায়।
(আবু দাউদ)

মহানবী (স.) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় উম্মতের জন্য শেষ বারের জন্য কিছু সর্তকবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেনঃ সাবধান, তোমরা বিগত জাতিগুলোর মত নবী ও সৎব্যক্তিদের কবরগুলোকে সেজদার স্থান বানিয়ো না। সাবধান, তোমরা আমার কবরকে বুৎখানারমত ইবাদত গৃহে পরিণত করো না।

এখানে বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। রসূল (স.) বলেনঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجدا

আল্লাহ ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদার স্থানে পরিণত করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং এরাতে সকল প্রকার বিদআত ও মনগড়া কাজ পরিহার করে তেলাওয়াত, নফল নামাজ, যিকির-আজকার, ইস্তিগফার, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি আমল একাকী করা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে, এরাতের জন্য বিশেষ কোন ইবাদত বা

নামাজ কোন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। তাই সাধারণ রাতের নফল নামাজের ন্যায়ই এরাতে নফল নামাজ বা ইবাদত করতে হবে। বিভিন্ন বই-পুস্তকে যে সব বিশেষ নামাজের নিময় বা পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে হাদীসে তার প্রমাণ নেই। তাই তা পরিহার বাঞ্ছনীয়। (আল মাওযুআতুল কুবরাঃ ১৬৫পৃ.)

মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ সাহেব (রহ.) এর দৃষ্টিতে বিদ'আত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَ أَيْضًا قَالَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ وَفِي الْبَابِ اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ وَ اٰثَارٌ شَهِيْرَةٌ تَدُلُّ عَلٰى قُبْحِ الْبِدْعَةِ وَ ذَمِّهَا وَ ذَمِّ فَاعِلِهَا وَ مُرْتَكِبِهَا حَتّٰى اَنَّ الْحَدِيْثَ الثَّانِيْ قَدْ دَلَّ عَلٰى كَوْنِهَا هَادِمَةً لِلدِّيْنِ أَيْضًا وَ يَدُلُّ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى حَدِيْثٌ آخَرُ أَيْضًا هُوَ اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَاِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ ثُمَّ الْحَدِيْثُ الْاَوَّلُ قَدْ دَلَّ عَلٰى مَفْهُوْمِ الْبِدْعَةِ وَ مَاهِيَّتِهَا اَيْضًا وَهُوَ اِحْدَاثُ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّيْنِ فِي الدِّيْنِ وَزِيَادَتُهُ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفِ حِفْظِ الدِّيْنِ عَلَيْهِ سَوَاءً كَانَ ذٰلِكَ مِنْ جِنْسِ الْعَقَائِدِ كَعَقَائِدِ الْفِرَقِ الْمُبْتَدِعَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَ اَهْلِ الْاِعْتِزَالِ وَالْمُرْجِيَّةِ وَ غَيْرِهِمْ مِمَّا تُخَالِفُ عَقَائِدَ اَهْلِ السُّنَّةِ اَوْ مِنْ جِنْسِ الْاَعْمَالِ كَاَكْثَرِ الْاَعْمَالِ الْمُرَوَّجَةِ فِي هٰذَا الزَّمَانِ بَيْنَ الْخَوَاصِ وَالْعَوَامِ كَمَا سَيَأْتِيْ ذِكْرُ بَعْضِهَا وَكِلَا هٰذَيْنِ النَّوْعَيْنِ اُمُوْرٌ مُحْدَثَةٌ مَرْدُوْدَةٌ مِصْدَاقُ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. نَعَمْ اَلنَّوْعُ الْاَوَّلُ اَقْبَحُ وَ اَشْنَعُ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِيْ وَاَمَّا الْاُمُوْرُ

الرُّسْمِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّقْرِيْبَاتِ كَتَقْرِيْبِ النِّكَاحِ وَالْخِتَانِ وَ غَيْرِهِمَا فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَعَاصِي وَالضَّلَالَاتِ لٰكِنَّهَا لَيْسَ بِبِدْعَاتٍ شَرْعًا لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَرْتَكِبُوْنَهَا اِتِّبَاعًا لِلرُّسُوْمِ وَ دَفْعًا لِلْعَارِ وَالشِّنَارِ وَ يَعْمَلُوْنَهَا رِيَاءً وَ سُمْعَةً وَ طَلَبًا لِحُسْنِ الذِّكْرِ لَا عَلٰى ظَنِّ أَنَّهَا أُمُوْرٌ دِيْنِيَّةٌ وَ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ كَمَا لَا يَخْفٰى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ فَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ جِنْسِ الْأُمُوْرِ الْمُحْدَثَةِ فِي الدِّيْنِ. وَأَمَّا مَا أُحْدِثَ بِسَبَبِ تَوَقُّفِ حِفْظِ الدِّيْنِ عَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ بِبِدْعَةٍ بَلْ أَمْرٌ مَأْمُوْرٌ بِهِ وَ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ تَوْضِيْحُ هٰذَا الْمَطْلَبِ وَ تَشْرِيْحُهُ أَنَّ الْأُمُوْرَ الدِّيْنِيَّةَ عَلٰى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ هِيَ أُمُوْرٌ دِيْنِيَّةٌ إِصَالَةً وَ ذَاتًا بِلَا وَاسِطَةِ شَيْئٍ آخَرَ مِنْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ كَالصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَقِرَأَةِ الْقُرْآنِ وَ أَمْثَالِهَا.

وَنَوْعٌ آخَرُ هِيَ أُمُوْرٌ دِيْنِيَّةٌ تَبْعًا وَ بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ دِيْنِيٍّ آخَرَ لَا بِالنَّظْرِ إِلَى الذَّاتِ كَاِحْدَاثِ الْمَدَارِسِ الدِّيْنِيَّةِ وَالْمَكَاتِبِ الْقُرْآنِيَّةِ وَ تَدْوِيْنِ عِلْمِ النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَتَعَلُّمِ عِلْمِ الْأَدَبِ وَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِأُمُوْرٍ دِيْنِيَّةٍ ذَاتًا وَ إِصَالَةً وَلٰكِنْ قَدْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا حِفْظُ الدِّيْنِ وَ تَحْصِيْلُ الْكَمَالِ فِي الْعُلُوْمِ الدِّيْنِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَصَارَتْ هٰذِهِ الْأُمُوْرُ أَيْضًا أُمُوْرًا دِيْنِيَّةً بِهٰذِهِ الْوَاسِطَةِ وَ صَارَتْ مَأْمُوْرَةً بِهَا وَمَنْدُوْبَةً إِلَيْهَا فَقَدْ عُلِمَ مِنْ هٰذَا الْبَيَانِ أَنَّ هٰذِهِ الْأُمُوْرَ وَ أَمْثَالَهَا مِمَّا تَوَقَّفَ عَلَيْهَا حِفْظُ الدِّيْنِ لَيْسَتْ هِيَ بِبِدْعَاتٍ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِي زَمَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا أُحْدِثَتْ لِحِفْظِ الدِّيْنِ وَ إِمْدَادِ الشَّرْعِ الْمَتِيْنِ فَهِيَ أُمُوْرٌ دِيْنِيَّةٌ تَبْعًا مَأْمُوْرَةٌ بِهَا مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ . نَعَمْ هِيَ بِدْعَاتٌ لُغَةً وَ هِيَ مَا حَدَثَتْ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فَعُلِمَ أَنَّ الْبِدْعَةَ لُغَةً بَعْضُهَا سَيِّئَةٌ وَ بَعْضُهَا حَسَنَةٌ.

وَأَمَّا الْبِدْعَةُ شَرْعًا وَهِيَ الَّتِي مَرَّ مَفْهُوْمُهَا وَمَا هِيَّتُهَا سَابِقًا فَكُلُّهَا سَيِّئَةٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ وَإِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَعُلِمَ مِنْ هٰذَا أَنَّ مَنْ

قَسَّمَ الْبِدْعَةَ إِلَى حَسَنَةٍ وَ سَيِّئَةٍ فَقَدْ أَرَادَ بِالْبِدْعَةِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيَّ لَا الشَّرْعِيَّ وَ أَيْضًا عُلِمَ أَنَّ بَيْنَ الْبِدْعَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ عُمُوْمٌ وَ خُصُوْصٌ مُطْلَقًا . اَلْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ خَاصٌّ وَالْبِدْعَةُ اللُّغَوِيَّةُ عَامٌّ وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي حَقِّ التَّرَاوِيْحِ مَعَ الْجَمَاعَةِ " نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ " فَقَدْ أَرَادَ بِهَا أَيْضًا مَعْنَاهَا لُغَةً" لَا شَرْعًا وَأَيْضًا اَلْبِدْعَةُ الْحَسَنَةُ عِنْدَ مَنْ يُقَسِّمُهَا أَنَّهَا تُوْجَدُ فِي الْوَسَائِلِ لَا فِي الْمَقَاصِدِ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ فِي الْمَقَاصِدِ كُلَّهَا سَيِّئَةٌ كَذَا ذُكِرَ فِي مَجَالِسِ الْأَبْرَارِ.

وَلَعَلَّكُمْ بَعْدَ مَا وَقَفْتُمْ عَلَى هٰذَا الْبَيَانِ عَلِمْتُمْ قَطْعًا أَنَّ هٰذِهِ الرُّسُوْمَ الْمُرَوَّجَةَ الْمُتَعَارِفَةَ بَيْنَ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِ فِيْ بَابِ إِيْصَالِ الثَّوَابِ إِلَى أَرْوَاحِ الْأَمْوَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ رُسُمِ الْفَاتِحَةِ الْمُرَوَّجَةِ وَغَيْرِهَا وَ رُسُمِ اِتِّخَاذِ مَحَافِلِ الْمِيْلَادِ وَ رُسُمِ قِيَامِ الْمِيْلَادِ وَ رُسُمِ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَثْنَاءِ الْوَعْظِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ مُجْتَمِعِيْنَ وَ رُسُمِ شَبِيْنَة خَوانِي وَ رُسُمِ دَعْوَةِ خواجگان الْمُرَوَّجَةِ فِيْ أَكْثَرِ الْمَدَارِسِ بَلْ فِي كُلِّهَا وَ أَمْثَالِهَا كُلِّهَا بِدْعَاتٌ شَرْعًا فَهِيَ مَذْمُوْمَةٌ قَبِيْحَةٌ لَا حَسَنَةٌ كَمَا ظَنَّ أَهْلُ الزَّمَانِ فَإِنَّهَا مُحْدَثَاتٌ جِدًّا وَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهَا حِفْظُ الدِّيْنِ وَلَا إِمْدَادُ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا أُمُوْرٌ دِيْنِيَّةٌ وَقُرُبَاتٌ مَقْصُوْدَةٌ إِصَالَةً وَظَاهِرٌ أَنَّ ذٰلِكَ تَبْدِيْلٌ لِلدِّيْنِ وَ كَذٰلِكَ رَفْعُ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ عَنْ مَرْتَبَتِهِ إِلَى مَا هُوَ فَوْقَهُ اِعْتِقَادًا أَوْ مُعَامَلَةً" بِأَنْ يُعَامِلَ بِهِ مُعَامَلَةَ مَا هُوَ فَوْقَهُ مَثَلًا يُعَامِلُ بِالْمُسْتَحَبِّ مُعَامَلَةَ السُّنَنِ وَ بِالسُّنَنِ مُعَامَلَةَ الْوَاجِبَاتِ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ أَيْضًا وَذٰلِكَ أَيْضًا نَوْعُ تَبْدِيْلٍ لِلدِّيْنِ وَ تَشْرِيْعٍ جِدًّا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. ثُمَّ اِعْلَمُوْا أَنَّ تَقْنِيْنَ قَوَانِيْنَ الشَّرْعِ وَ تَعْيِيْنَ أَوْضَاعِ الدِّيْنِ وَ أَحْكَامِهِ إِنَّمَا هُوَ شَأْنُ أَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ فَمَنْ اِبْتَدَعَ فِي الدِّيْنِ شَيْئًا كَأَنَّهُ اِدَّعَى بِلِسَانِ حَالِهِ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَ مَنْ اِتَّبَعَهُ فَكَأَنَّهُ يَعْتَقِدُهُ نَبِيًّا وَ ذٰلِكَ إِشْرَاكٌ فِي النُّبُوَّةِ فَالْبِدْعَةُ شِرْكٌ فِي النُّبُوَّةِ.

ثُمَّ اِعْلَمُوْا اَنَّ هٰذِهِ الْاَدْعِيَّةَ الشَّائِعَةَ الْمُتَعَارِفَةَ بَيْنَ الْخَوَاصِ وَالْعَوَامِ بِالْهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ رَافِعِيْنَ اَيْدِيْهِمْ فِى هٰذِهِ الْاَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ كَالدُّعَاءِ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الْوَعْظِ و خَتْمِهِ وَكَالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ اَوْ بَعْدَ خُطْبَتِهِمَا وَكَالدُّعَاءِ فِى صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ بَعْدَ كُلِّ تَرْوِيْحَةٍ وَ بَعْدَ الْوِتْرِ بِالْهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَكَالدُّعَاءِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِالْهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَكَالدُّعَاءِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ مُجْتَمِعِيْنَ وَكَالدُّعَاءِ الْحَادِثِ فِى هٰذِهِ الْاَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ يَوْمَ خَتْمِ الْبُخَارِىْ بِاِهْتِمَامٍ شَدِيْدٍ وَكَالدُّعَاءِ لَيْلَةَ تَمَامِ خَتْمِ التَّرَاوِيْحِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِاِهْتِمَامٍ مُجْتَمِعِيْنَ وَكَذٰلِكَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ بِالْهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ رَافِعِيْنَ الْاَيْدِىْ كُلُّ هٰذِهِ اُمُوْرَ حَادِثَةً لَمْ تَكُنْ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِى زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ يَقِيْنًا اِنَّمَا حَدَثَتْ بَعْدَ تِلْكَ الْاَزْمِنَةِ الْمُتَبَرِّكَةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا اُمُوْرًا دِيْنِيَّةً بِالذَّاتِ اِصَالَةً حَتّٰى صَارَتْ كَاَنَّهَا شَعَائِرُ الدِّيْنِ قَدْ شَقَّ تَرْكُهَا عَلَى النَّاسِ حَتّٰى عَلَى الْخَوَاصِ اَيْضًا. نَعَمْ قِرَأَةُ بَعْضِ اَلْفَاظِ الْاَذْكَارِ وَ بَعْضُ اَلْفَاظِ الْاَدْعِيَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَاتِ ثَابِتَةٌ مَسْنُوْنَةٌ يَقِيْنًا لٰكِنْ عَلٰى طَوْرِ الْاِنْفِرَادِ بِغَيْرِ رَافِعِى الْاَيْدِىْ لَا عَلٰى طَوْرِ الْهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ رَافِعِيْنَ الْاَيْدِىْ. ثُمَّ اِنَّ الدُّعَاءَ مِنْ جِنْسِ النَّوَافِلِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَلَا جَمَاعَةَ وَلَا تَدَاعٰى فِيْهَا (اَىْ فِى النَّوَافِلِ) بَلْ هِىَ بِلُحُوْقِ التَّدَاعِى وَالْاِهْتِمَامِ تَصِيْرُ بِدْعَةً وَمَكْرُوْهَةً وَ اَيْضًا رَفْعُ الْيَدِ فِى الدُّعَاءِ لَيْسَ مِنْ اٰدَابِ جَمِيْعِ اَفْرَادِهِ كَالدُّعَاءِ عِنْدَ اللُّبْسِ وَ عِنْدَ دُخُوْلِ الْبَيْتِ وَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَ دُخُوْلِ بَيْتِ الْخَلَاءِ وَعِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنْهَا وَ كَذٰلِكَ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَاتِ وَ بَعْدَ الْاَذَانِ وَالْاَكْلِ بِالْجُمْلَةِ فِى اَىِّ مَوْضَعٍ ثَبَتَ فِيْهِ الدُّعَاءُ وَلَمْ يَثْبُتِ الرَّفْعُ فَالرَّفْعُ فِيْهِ غَيْرُ مَسْنُوْنٍ بَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ جِدًّا وَفِى دُعَاءٍ ثَبَتَ فِيْهِ الرَّفْعُ فَالرَّفْعُ مِنْ اٰدَابِهِ وَ كَذٰلِكَ اِذَا اَرَادَ اَحَدَ اَنْ يَدْعُوْ فِى مَوْضَعٍ اَوْ فِىْ وَقْتٍ لَمْ يَرِدْ فِيْهِ دُعَاءً مَخْصُوْصٌ فَاَرَادَ

اَحَدَ اَنْ يَدْعُوا اللّٰهُ فِيْهِ عَلٰى طُوْرِ الْاِتِّفَاقِ لَا بِنِيَّةِ الْاِسْتِنَانِ فَالرَّفْعُ يَكُوْنُ مِنْ اٰدَابِهٖ اَيْضًا فَافْهَمْ حَقٌّ التَّفَهُّمِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَ عِلْمُهُ اَتَمُّ

অনুবাদঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং দরূদ ওসালাম রসূলে করীম(স.) এর উপর। অতঃপর- রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ধর্মের মধ্যে এমন কোন নতুন কাজ সংযোজন করল যা এ ধর্মে নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান করলো সে যেন ধর্মের মুলৎপাটনে সাহায্য করল। এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস রয়েছে যা বিদআত এবং বিদ'আতকারী নিন্দিত হওয়ার উপর প্রমান করে। এমনকি (উল্লিখিত) ২য় হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্বীনের মূলৎপাটনকারী হলো বিদ'আত কাজ। এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসে রসূলে করীম (স.) বলেন, তোমরা দ্বীন ও শরীয়তের সীমা লজ্ঘন হতে বেঁচে থাক। কেননা তোমাদের পুর্ববর্তী উম্মত দ্বীনের কাজে সীমা লজ্ঘন করার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

অতপর জ্ঞ্যাতব্য যে, প্রথম হাদীস দ্বারা বিদ'আতের অর্থ ও মূল বিষয় জানা গেল যে, বিদআত হলো দ্বীনের মধ্যে এমন কাজ সংযোগ বা আবিস্কার করা যা মূলত দ্বীনের মধ্যে নেই। আবার দ্বীন সংরক্ষণের বিষয়ও তার উপর মূলতবী নয়। এমন নতুন বিষয়, হতে পারে তা আকীদাগত যেমন, খারজী, রাফেজী, মুতাযেলা, মারযিয়্যাহ ও অন্যান্য পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাস যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থী। অথবা হতে পারে তা আমলের দিক দিয়ে। যেমন বর্তমানে সর্বসাধারণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিদের (ওলামায়ে কেরাম) মধ্যে ও এমন অনেক কাজের প্রচলন রয়েছে--- যার আলোচনা সামনে আসছে। এই দু প্রকার বিদআত দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোযিত, কাজেই তা প্রত্যাখিত এবং মহানবী (স.) এর বাণী, **প্রত্যেক নতুন কাজ বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত পথ ভ্রষ্ঠতা** এই হাদীসের সত্যায়নকারী। তবে ২য় প্রকার হতে প্রথম প্রকার বেশি খারাপ ও নিন্দনীয়।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমাজে প্রচলিত বহু অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ-শাদী, খাতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রচলন, যদিও তা গোনাহের কাজ; কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা যাবে না। কেননা মানুষ এসব কাজ প্রচলিত প্রথা এবং অন্যের কুৎসা হতে বাঁচার জন্য করে থাকে। এসব কাজের উদ্দেশ্য শুধু লোক দেখান এবং মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করা ও প্রশংসা কুড়ান। এটিকে তারা দ্বীনের কাজ বা শরীয়তের

হুকুম মনে করে না। (কেননা বিদআত হলো শরীয়ত স্বীকৃত নয় এমন কাজকে শরীয়তের কাজ মনে করে করাকে) কাজেই উক্ত দ্বীন পরিপন্থীঅনুষ্ঠানসমূহ বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে নতুন আবিষ্কৃত এমন কাজ যার উপর ধর্মের বিষয় সংরক্ষণ নির্ভর করে তা বিদআত নয়। বরং এমন কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যার আলোচনা এরূপঃ

দ্বীনি কাজ দু প্রকার। প্রথমতঃ. মূলগতভাবেই দ্বীনি কাজ হিসেবে গণ্য। যেমন নামাজ রোযা, তাসবীহ, তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াতসহ এ ধরণের যত ইবাদত আছে। দুই. যা প্রত্যক্ষ ও মূলগতভাবে দ্বীনের কাজ নয়। কিন্তু দ্বীনি কাজের সহায়ক হওয়ার কারণে তা পরোক্ষভাবে দ্বীনি কাজে পরিণত হয়েছে। যেমদ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা করা, ইলমে নাহু ও ইলমে সরফের উদ্ভাবন, ইলমে আদব (সাহিত্যে) শিক্ষা ও চর্চা করা। এগুলো প্রত্যক্ষ দ্বীনি কাজ নয়, তবে যেহেতু দ্বীন সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পূর্ণতা এসবের উপর নির্ভরশীল, তাই এগুলো দ্বীনি কাজ বলে বিবেচিত। এহিসেবে একাজগুলোও শরীয়তে আদিষ্ট ও পুণ্যের কাজ বলে স্বীকৃত।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, যে সমস্ত কাজের উপর দ্বীন নির্ভরশীল যদিও সলফে সালেহীনদের যুগে বর্তমান ছিল না, শরীয়তের পরিভাষায় তা বিদআত নয়। কেননা তার অবিষ্কার দ্বীন সংরক্ষণ ও দ্বীনের সাহায্যের জন্যই করা হয়েছে। তাই পরোক্ষ ভাবে তা দ্বীনি কাজ বলে পরিগণিত হবে। এটিই শরীয়তের হুকুম।

তবে হ্যাঁ, আভিধানিক অর্থে তাকে বিদআত বলা যেতে পারে। যেহেতু তা ছিল না, পরে নতুনভাবে হয়েছে। এথেকে জানা গেল যে, বিদআত আভিধানিক অর্থে কিছু খারাপ এবং কিছু ভাল। কিন্তু শরীয়তের বিদআত যা উপরে বর্ণিত হয়েছে তা সার্বিক ভাবেই খারাপ (সায়্যেয়াহ)। একথার প্রমাণ রসূলে করীম (স.) এর এই হাদীসঃ তোমরা নিজেদেরকে নব আবিষ্কৃত কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত কাজ বিদআত আর প্রত্যেক বিদ'আতাই (শরীয়ী বিদ'আত) পথভ্রষ্ঠতা।

কাজেই জানা গেল যে, যারা বিদআতকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন (সায়্যেয়াহ ও হাসানা) তারা আভিধানিক অর্থেই তা করেছেন। তা শরীয়ী বিদআত নয়। আরো জানা গেল যে, এ দুটি বিদআতের (শরীয়ী ও আভিধানিক) মধ্যের সম্পর্ক হলো আম, খাস মুতলাকের। শরয়ী দিবআত হলো খাছ (নির্দিষ্ট) এবং আভিধানিক বিদআত হলো আম তথা ব্যাপক।

হযরত ওমর (রা.) তারাবীহের নামাজ জামাতের সাথে আদায় হতে দেখে যে বলেছিলেন, কতই না উত্তম বিদআত এটি, আভিধানিক বিদআত উদ্দেশ্য, শরয়ী বিদআত নয়।

দ্বিতীয়তঃ বিদআতে হাসানা এবং সায়্যেবা-এর ভাগ ঐ সমস্ত বিদ'আতের মধ্যে হবে যা পরোক্ষভাবে ইবাদত হিসেবে গণ। তবে যে ইবাদত প্রত্যক্ষ ভাবেই ইবাদত হিসেবে গণ্য তার মধ্যে সার্বিকভাবে বিদআতে সায়্যেয়াহ হবে। মাজালিসুল আবরারে তার উল্লেখ আছে।

উল্লিখিত বর্ণনার পর এটি আপনারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসালে সওয়াবকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত প্রথা সর্ব সাধারণ এবং বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচলিত তা বিদআত। অনুরূপভাবে ফাতিহা পাঠের প্রথা, মীলাদ মাহ্ফিলের প্রথা, মীলাদে ক্বিয়ামের প্রথা এবং ওয়াজের মধ্যে উচচ স্বরে সম্মিলিতভাবে দরূদ পাঠের প্রথা, শবীনা খতমের প্রথা, খতমে খাজেগানের প্রথা যা সমস্ত মাদরাসাতে প্রচলিত আছে। এগুলো বিদআতে শরয়ী, হাসানা নয় যা অধিকাংশ মানুষ ধারণা করে এবং অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। কেননা এগুলো নতুন আবিষ্কৃত কাজ এবং এর উপর দ্বীন সংরক্ষণ মুলতবী নয় এবং দ্বীনের সাহায্যকারী কোন বিষয়ও নয়। একাজকে দ্বীনি কাজ ধারণা করে সত্বাগত ইবাদত মনে করে আবিষ্কার করা হয়েছে। এটি প্রকাশ্যভাবে দ্বীনকে পরিবর্তন করার নামান্তর। দ্বীনের একটি হুকুমকে বিশ্বাসগত বা আমলগত দিক হতে তার স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে নেয়া গর্হিত কাজ। এযেন মুস্তাহাবের সাথে সুন্নাতের এবং সুন্নাতের সাথে ওয়াজিবের ব্যবহার। এগুলোও বিদ'আত এবং পথভ্রষ্ঠতা। এটিও এক প্রকার শরীয়ত পরিবর্তন করে নতুন শরীয়তের আবির্ভাব ঘটানো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, শরীয়তের কানুন প্রণয়ন করা এবং ধর্মের হুকুম আহকাম এবং তার কেন্দ্রস্হল নির্ধারণ করার দায়িত্ব নবী-রসুলদের। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কাজ আবিষ্কার করে সে যেন অস্হায়ী নবী হওয়ার দাবী করলো।

আর যে সমস্ত মানুষ তার অনুসরণ করে তারা যেন তাকে নবী নিসেবে মান্য করলো। সন্দেহাতীতভাবে এটি শির্ক ফিন্ নবুওয়াত। অর্থাৎ নবুওয়াত এবং নবী হওয়ার মধ্যে গাইরে নবীকে শরীক করা হলো। কাজেই এটি বিদ'আত **শির্ক ফিন্ নুবওয়াত** এর পর্যায়ভূক্ত; যা যঘন্য কাজ।

জানা আবশ্যক যে, সম্মিলিতভাবে দুহাত উত্তোলনপূর্বক দুআ করা যা সর্বসাধারণ ও আলেমদের মধ্যেও বিদ্যমান; যেমন ওয়াজ এর শুরু এবং শেষে দুআ করা, দুই

ঈদের নামাজ ও খুতবার পর, তারবীহের নামাজের প্রতি ৪ রাকাতে অথবা বেতরের নামাজের পর, বিবাহ সম্পাদনের পর, কবর যিয়ারতের পর, বুখারী খতমের পর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দুআ করা যা বর্তমানে আবিষ্কার হয়েছে। এমনিভাবে রমজানে খতমে তারাবীহের রাতে অধিক গুরুত্বের সাথে সম্মিলিতভাবে দুহাত তুলে দুআ করার প্রথা নব আবিষ্কৃত; এসব কাজ নিঃসন্দেহে রসূলে করীম (স.) এর যুগে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেযীদের যুগে ছিল না। আবার দ্বীন সংরক্ষণও তার উপর মুলতবী নয়। এমনকি দ্বীনের অত্যাবশ্যক বিষয়াদিও তার উপর নির্ভর করে না। (অর্থাৎ বিষয়গুলো এমন নয় যে, না করলে দ্বীনের ক্ষতি হবে অথবা করলে দ্বীনের উপকার হবে)। এসব বিষয়কে প্রত্যক্ষ দ্বীন ভেবে নতুনভাবে আবিস্কার করা হয়েছে। এমনকি এসমস্ত কাজ বর্তমানে ধর্মের নির্দেশাবলীর স্থান দখল করে আছে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আলেম-উলামাদের পক্ষেও এসব কাজ ছেড়ে দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে ফরজ নামাজের পর বিভিন্ন দুআ পাঠ এবং যিকির করা সুন্নত। এটি হতে হবে একাকী হাত না উঠিয়ে। সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে নয়। একথাও উত্তম রূপে হৃদয়াঙ্গম করা চাই যে, দুআসমূহ মুস্তাহাব ও নফল কাজের মধ্যে গণ্য। নফল ও মুস্তাহাব কাজে জামাতবদ্ধ হওয়া ও তার জন্য অন্যকে আহবান করার কোন বিধান শরীয়তে নেই। বরং মুস্তাহাব কাজে শরীক হওয়ার জন্য অন্যকে আহবান করার কারণে তা বিদআতে রূপ নেয় এবং মাকরুহ কাজে পরিণত হয়।

মনে রাখতে হবে হাত উত্তোলন করা সব দুআর শিষ্টাচার নয়। যেমন কাপড় পরিধান করার দুয়া, ঘরে প্রবেশের দুআ, মসজিদে প্রবেশের দুআ, পায়খানায় প্রবেশের দুআ, সেখান হতে বের হওয়ার দুআ, ফরজ নামাজের পর দুআ, আযানের দুআ, আহারের দুআ ইত্যাদির ব্যাপারে হাত উত্তোলন করার বিধান শরীয়তে নাই।

মোট কথা শরীয়তে যে সমস্ত স্থানে দুআ করার বিধান আছে কিন্তু হাত উত্তোলন করতে হবে তার প্রমাণ নেই, সে স্থানে হাত উত্তোলন করা নিশ্চিতভাবে সুন্নতের পরিপন্থী। আর যে দুআতে হাত উত্তোলন করার বিষয়টি প্রমাণ আছে শুধু সেখানেই হাত উঠান দুআর শিষ্টাচার। যেমন ইস্তেস্কা, কুসুফ, খুসূপ ও আরাফাতে অবস্থানের সময়, সাফা-মারওয়ায় অবস্থানের সময়। এমনিভাবে যে স্থানে বা সময়ে,শরীয়ত কর্তৃক কোন বিশেষ দুআ পড়ার বিধান নেই এমন স্থানে ঘটনাক্রমে যদি কেউ দুআ করার ইচ্ছা করে (সুন্নতের ধারণা না করে) তবে সেখানেও হাত উত্তোলন করা দুআর শিষ্টাচারের মধ্যে শামিল হবে। এব্যাপারে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। (আল্লাহ সর্বোজ্ঞ)

সুদ ও বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা

আল্লাহ সুদকে হারাম এবং ব্যবসাহে হালাল করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوٰى (আল্লাহ সুদকে হারাম এবং ব্যবসাকে হাললা করেছেন) আর এটি এ জন্য যে, সুদের মাধ্যমে সমাজের একটি শ্রেণী অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে। ফলে সমগ্র জাতি এক মহা সংকট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাই আল্লাহ সুদখোরদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِتَّقُوْا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক সুদ বর্জন করাকে ঈমানের আলামত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং সুদের বেসারতি করাকে আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহর রসূল শুধু সুদ ভক্ষণকারীকেই নয়, তাকে সাহায্যকারীর উপরও অভিসম্পাত প্রদান করেছেন। তিনি বলেনঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَ مُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَ شَاهِدَهٗ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . مسلم. مشكوة. ٢٤٤

আল্লাহর রসূল সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, লেখক এবং সুদী কারবারের লেনদেনের প্রত্যক্ষর্শীদেরকে কিম্বা সাক্ষ্য দাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন এরা সবাই সমান গোনাহগার। (মুসলিম, মেশ্কাতঃ ২৪৪)

অথচ সুদী লেনদেন আজ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজিত। বিশ্বব্যাপী ব্যাংক, বীমা, সংস্থা ইত্যাদি সুদী কারবারে মত্ত এনজিওরা মোটা অংশে সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করছে। সুদী কারবারের হোতা ইহুদিরা তাদের সুদী চক্রান্তের জাল

বিশ্বব্যাপী পঙ্গ পালের ন্যায় ছড়িয়ে দিয়েছে। সমাজের সিংহ ভাগ মানুষ সুদের অভিশাফে নিঃস্ব ও সর্বসান্ত হয়ে পড়ছে। আর স্বল্প সংখ্য মানুষ ও দেশে হয়ে উঠছে ধনপতি। সুদী অভিশাপের নির্মম ছোবল হতে জাতি, দেশ ও বিশ্বকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন বিনা সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। এজন্য শরীয়া ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা, সংস্থা স্থাপনের বিকল্প নেই। তবে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র ইসলামী নাম দিলেই তা ইসলামী হয়ে যায় না। ইসলামী হওয়ার জন্য প্রয়োজন সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি অবলম্বন। কিন্তু বর্তমানে সরল প্রাণ মুসলিম উম্মাকে ধোকা দেয়ার জন্য ইসলামী নামে অনেক ব্যাংক, বীমা ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব ব্যাংক, বীমা ও সংস্থার কার্যক্রম ও মাঠ পর্যায়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে যে, তারাও সুদ হতে মুক্ত নয়। এ ব্যাপারে হাটহাজারী মাদ্‌রাসার ফতোয়া বিভাগ কর্তৃক একটি ফতোয়া নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা রাখা বৈধ কি না?

সমাধানঃ

আমাদের জানা মতে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক একশভাগ সুদমুক্ত নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে এ ব্যাংকের সম্পর্ক বিদ্যমান। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সুদ ভিত্তিক পরিচালিত। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকের অনেক নিয়ম-নীতি ও লেনদেন অস্পষ্ট ও আপত্তিকর। কাজেই এ ব্যাংকের মুনাফা একশ ভাগ সুদমুক্ত নয় বলে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। সেহেতু এর সাথে লেনদেন করাও ঠিক হবে না। (সূরা বকারাঃ ২৭৫, তিরমীজিঃ ১/২২) মাসিক মুঈনুল ইসলাম ১৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ইং)

দুনিয়াদার আলেম ও পীরদের খেদমতে---

বর্তমান সমাজ শিরক 'ও বিদআতের সমুদ্রে নিমজ্জিত। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, পীর-মাশায়েখ ও উলামায়ে কেরামগণের ধর্মের প্রতি উদাসীনতা এবং সৎ কাজে আদেশ দান হতে বিরত থাকা। অথচ তাদের কাজই হলো এটি । যেমন বলা হয়েছেঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা চাই, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজে আদেশ দান করবে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে এবং তারাই সফলকাম হবে। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

বনী ইস্রাইল জাতির মধ্যে যারা কাফির তারা হযরত দাউদ (আ.) এবং বিবি মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা (আ.) এর রসনায় অভিশপ্ত। এর কারণ হলো, তারা ছিল পাপিষ্ট, সীমালজ্ঘনকারী এবং তারা পরস্পর অসৎকাজে বাধা প্রদান করতো না, তারা মন্দ কাজে অভ্যস্হ ছিল।

এই আয়াতে আল্লাহ পাক কঠোর ভাষায় এই উক্তি করেছেন যে, তারা অসৎ কাজে বাধা প্রদান করাকে পরিহার করেছিল।

বর্তমানে পথ ভ্রষ্ঠ পীরের অভাব নাই। সরল ধর্মপ্রান মুসলমানগণ তাদের নিকট গিয়ে অর্থকড়িসহ হারাচ্ছে ঈমান-আমল। এসমস্ত পীরেরা দ্বীনের নামে শিরক ও বিদ'আত প্রচারে লিপ্ত। যে কোন অসৎ কাজে অর্থের লোভে তাদের সহযোগিতার হাত অনেক দীর্ঘ। অথচ আল্লাহ বলেনঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা সৎকাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালজ্ঘনে সহযোগিতা করো না ।

এখানে সহযোগিতার অর্থ সৎ কাজে অন্যকে উৎসাহ প্রদান বা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করা এবং যথাযথ অনিষ্ট হতে সীমালজ্ঘনের পথ রুদ্ধ করা।

রসূলে করীম (স.) সৎ কাজের অদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ বর্জনের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলেনঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ عَمِلُوْا بِالْمَعَاصِىْ وَفِيْهِمْ مَنْ يَّقْدِرُ اَنْ يُّنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ اِلاَّ يُوْشِكُ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ (احياء العلوم، ٣٠٨)

যে সম্প্রদায় গুনাহের কাজ করে এবং তাদের মধ্যে সক্ষম লোক থাকা সত্তেও যদি তারা তা থেকে বিরত না রাখে তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবার প্রতি আযাব অবতীর্ণ করবেন। (ইহয়াউল উলুমঃ ৩০৮)

হীন স্বার্থ চরিতার্থে লিপ্ত বাতিল পীর আলেমগণ ইহুদিদের আলেমদের ন্যায় প্রকৃত সত্যকে গোপন করে শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় হক্কানী আলেমদের কর্তব্য তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এবং এ কাজ হতে তাদের বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তা না করে মৌণতা অবলম্বন করা অর্থ তাদের শরীয়ত বিরোধী কাজের সহায়তা করা। এ ব্যাপারে হাদীসে সর্তক করে দেয়া হয়েছে। যেমন আবু উমামা বাহেলী (রা.) বলেন, রসূলে করীম (স.) বলেছেনঃ

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا طَغٰى نِسَائُكُمْ وَفَسَقَ شُبَّانُكُمْ وَ تَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ قَالُوْا اِنَّ ذٰلِكَ لَكَائِنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ وَ اَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُوْنُ. قَالُوْا وَمَا اَشَدُّ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَمْ تَأْمُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ قَالُوْا وَكَائِنٌ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ نَعَمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ وَ اَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُوْنُ، قَالُوْا وَمَا اَشَدُّ مِنْهُ؟ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوْفَ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرَ مَعْرُوْفًا قَالُوْا وَكَائِنٌ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ وَاَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُوْنُ قَالُوْا وَمَا اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا اَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوْفِ ؟ قَالُوْا وَكَائِنٌ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ وَاَشَدُّ

مِنْهُ سَيَكُوْنُ؟ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِىْ حَلَفْتُ لَأُتِيْحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَصِيْرُ الْحَلِيْمُ فِيْهَا حَيْرَانٌ، احياء العلوم الدين، ج ٣ب، ص٣٨–٣٠٩)

তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের স্ত্রীরা অবাধ্য হবে, তোমাদের যুবক শ্রেণী অপকর্মে লিপ্ত হবে, তোমরা জিহাদ বর্জন করবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ এরূপ কি অবশ্যই হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম, এর চেয়ে?ও গুরুতর ব্যাপার হবে। আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার কি হতে পারে? তিনি বললেন, তোমাদের অবস্থা কি হবে যখন তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে না এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে না? আরজ করা হলো, এরূপ কি হবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, এর চেয়েও মারাত্মক কাজ হবে। সমবেত জনতা জানতে চাইল, এর চেয়েও গুরুতর কাজ কি হতে পারে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, তোমাদের অবস্থা কি হবে যখন তোমরা সৎ কাজকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ মনে করবে? তারা জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল এটি কি করে হবে? তিনি বললেন, তোমাদের অবস্থা কি হবে যখন তোমরা অসৎকাজের আদেশ এবং সৎ কাজের নিষেধ করবে? শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল এরূপ কি আদৌ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার ঘটবে। আল্লাহ নিজে কসম খেয়ে বলেছেন, আমি তাদের উপর এমন মুছিবত চাপিয়ে দিব যে, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরাও বিপদে পড়বে। (এইয়াউল উলুমঃ ২/৩০৯)

বর্তমানে ধর্মীয় ব্যাপারে যে সমস্ত ফেৎনা সৃষ্টি হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী কুচক্রিদের ষড়যন্ত্র এবং কিছু দুনিয়াদার আলেম। এরা অনেক ক্ষেত্রে কুচক্রিদের হাতিয়ার হয়ে এবং ইসলাম বিদ্বেষী শাসকগোষ্ঠির ছত্র ছায়ায় হারামকে হলাল এবং হালাল কে হারাম বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যাপারে মুখ্য ভুমিকা পালন করছে। এদের সম্পর্কে আঃ ইবনু মাসউদ বলেনঃ

لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْا الْعِلْمَ وَ وَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْا بِهٖ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْا لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهٖ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ. رواه ابن ماجه، مشكوت، ٣٨.

যদি আলিমগণ ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে তা সোপর্দ করতেন, তা হলে নিশ্চয় তারা এর দ্বারা নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব

দিতে পারতেন। কিন্তু তারা তা দুনিয়ার জন্য ব্যয় করেছে দুনিয়ার কিছু লাভের আশায়। ফলে তারা দুনিয়াদারীদের নিকটও মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে।
অন্য হাদীসে এসেছেঃ

خَيْرُ الْخِيَارِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ وَشَرُّ الشِّرَارِ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ

সর্বোত্তম ভাল হলো ভাল আলেম, আর নিকৃষ্ট খারাপ হলো খারাপ আলেম।
ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করে যদি সে অনুপাতে কাজ না করা হয় তা হলে তার মত হতভাগা আর কে হতে পারে? হাদীসের ভাষায় তাদেরকে علماء سوء বলা হয়। অর্থাৎ অসৎ আলেম। মহানবী (স.) এদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। যেমন একটি হাদীসে এসেছেঃ

مَنْ قَرَءَ الْقُرْآنَ وَ تَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ ثُمَّ اَتٰى صَاحِبَ سُلْطَانٍ طَمْعًا لِمَا فِى يَدِهٖ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ وَعَذَّبَ كُلَّ يَوْمٍ بِلَوْنَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يُعَذِّبْ بِهٖ قَبْلَ ذٰلِكَ (كنز العمال)

যে ব্যাক্তি কুরআন শিক্ষা করে দ্বীনের গভীর পান্ডিত্ব হাসিল করে অতপর কিছু পাওয়ার আশায় সরকারী দরবারে যাতায়াত করে আল্লাহ তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দিবেন এবং তাকে এমন দুটি শাস্তি প্রত্যহ দেয়া হবে যা ইতোপূর্বে আর কাউকে দেয়া হয়নি। (কানযুল উম্মাল)
সরকার ঘেসা আলেমদের পরিণতি সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসে এসেছেঃ

اَلْعُلَمَاءُ اُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُخَالِطُوا السُّلْطَانَ وَيُدَاخِلُوا الدُّنْيَا فَاِذَا خَالَطُوْا السُّلْطَانَ دَاخَلُوا الدُّنْيَا فَقَدْ خَانُوا الرُّسُلَ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاعْتَزِلُوْهُمْ (كنز العمال)

আলেমগণ প্রকৃত অর্থে আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দাদের জন্য আমানত গচ্ছিতকারী স্বরূপ। কিন্তু আলেম হওয়া সত্বেও দুনিয়ার লোভে ক্ষমতাসীন লোকদের দরবারে যাতায়াত করে এবং অর্থলিপ্সু হয়, তারা আলেম হওয়া সত্বেও রসূলের আমানতের খেয়ানতকারী বলে বিবেচিত হবে। কাজেই হে মুসলিম জনতা, তোমরা এধরণের আলেম হতে সর্তক হবে এবং দূরে থাকবে। (কানযুল উম্মাল) । এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসে এসেছেঃ

اِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ يُخَالِطُ السُّلْطَانَ مُخَالَطَةً كَثِيْرَةً فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَصٌّ (كنز العمال)

তোমরা যখন দেখবে কোন আলেম সরকারের সাথে বেশি মেলামেশা করছে জেনে রাখবে সে আলেম নয়; দ্বীনের চোর। (কানযুল উম্মাল)

যারা ইসলাম বিদ্বেষী শাসক গোষ্ঠির তোষামদি করে মনে করে যে, আমরা তাদের থেকে দুনিয়া নিয়ে তাদেরকে দ্বীন দেব, এতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবে না, তাদের এ ধারণা অত্যন্ত জঘন্য। এ ব্যাপারে রসুলে করীম (স.) বলেছেনঃ

إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَ نَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنَ ذٰلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الْخَطَايَا ، مشكوة

আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে যে, কুরআন পাঠ করবে, দ্বীনের গভীর পান্ডিত্ব অর্জন করবে, তারা বলবে আমরা শাসকগোষ্ঠির সাথে মেলামেশা করে অর্থ উপার্জন করবো এবং আমাদের খোদাভীতির দ্বারা তাদের অপকারিতা হতে বেঁচে থাকব, এটি সম্ভব নয়। যেমন কাটার আঘাত ছাড়া বাবুল গাছের নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে (অসৎ উদ্দেশ্যে) সরকারের নৈকট্য লাভের দ্বারা গোনাহ ছাড়া কিছু অর্জিত হয় না। (মিশকাত)

ইসলাম বিদ্বেষী শাসক গোষ্ঠির তাবেদার আলেম সম্পর্কে এমন অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে বিপথগামী অথবা ইসলাম বিদ্বেষী শাসকগোষ্ঠিকে সৎ পথে আনার জন্য যাতায়াত করা বা সখ্যতা গড়ে তোলা নিন্দনীয় নয়। বরং তা উৎকৃষ্ট জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। যেমন বলা হয়েছেঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

ভুল ও বিপথগামী শাসকগোষ্ঠির সামনে হক কথা বলা শ্রেষ্ঠ জেহাদ।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, শ্রেষ্ঠ জিহাদের মর্তবা অর্জন করতে হলে ইসলাম বিদ্বেষী ও বিপথগামী শাসকগোষ্ঠির নিকট গিয়ে তাদেরকে পথ দেখানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে হবে। অর্থাৎ হক্কানী আলেমদের কর্তব্য বিপথগামী শাসকগোষ্ঠিকে সৎ পথে আনার চেষ্টা করা।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, যদি এই শ্রেষ্ঠ জিহাদ অর্জন করতে গিয়ে কেউ শাহাদাত বরণ করেন, তবে তিনি শ্রেষ্ঠ শহীদ বলে বিবেচিত হবেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং দ্বীন রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগের তাউফিক দিন।

এক নজরে কতিপয় প্রচলিত বিদআত

শরীয়তের বিধান মনে করে ছোয়াবের আশায় নিম্ন লিখিত কাজসমুহ করা বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত কাজ হতে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন।

* দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে সুরে সুর মিলিয়ে যিকির করা বিদ'আত।
* ফরজ নামাজের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করার যে প্রথা চালু আছে তা বিদ'আত।
* যে দুআ করার সময় হাত উত্তোলনের প্রমান নেই তাতে হাত উত্তোলন করা।
* ঈদের নামাজ ও খুতবার পর সম্মিলিতভাবে দুআ করা।
* জুমার সুন্নাত নামাজের পর সম্মিলিতভাবে দুআ করা।
* তারাবীহের প্রত্যেক ৪ রাকাতে অথবা সর্বশেষে সম্মিলিতভাবে দুআ করা।
* তারাবীহের প্রত্যেক চার রাকাতে سبحان ذى الملك অথবা অন্য কোন দুআ নিয়মিত পাঠ করাকে আবশ্যক মনে করা।
* রমজান মাসে বা অন্য কোন সময়ে নফল নামাজে জামাত করা।
* রমজানের শেষ জুমাকে **জুমাতুল বিদা** বলে আখ্যায়িত করে সে বিষয়ে খোতবা পাঠ করা এবং মহল্লার মসজিদ ছেড়ে সে দিন শহরের বড় মসজিদে নামাজ আদায় করা।
* আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ করা। তবে আযানের পরে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।
* আযানের সময় **রসূল** (স.) এর নাম শ্রবণ করে আঙুলে চুম্বন করা এবং আযান শেষে হাত উঠিয়ে দুআ করা।
* বিশেষ কোন নামাজের পর বা ঈদের নামাজের পর মুয়ানাকা ও মুসাফাহা করা।
* খোতবার আযানের উত্তর দেয়া। অনুরূপভাবে দুআ পড়া. মাকরুহ।
* অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচলিত খতমে খাজেগান করা।
* প্রচলিত খতেম ইউনুছ ও বোখারী খতমের অনুষ্ঠান গুরুত্বের সাথে করা।
* কেউ মারা গেলে তার চল্লিশা বা দশা করা এবং যিয়াফত করা।
* ইসালে ছওয়াবের জন্য হাফেজ ডেকে কুরআন খতম করা।

* ইসালে ছওয়াব ও কবর যেয়ারত করে তার প্রতিদান গ্রহণ করা হারাম।
* পীর-দরবেশদের মাযারে মান্নত করা। বরং এটি শির্ক।
* কবরে বাতি জ্বালান, ফূল ছড়ানো, চাদর দ্বারা ঢেকে রাখা ও চুম্বন করা।
* কবরের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা ও সিজদা করা হারাম ও শির্ক।
* কবরকে কেন্দ্র করে ওরশ করা।
* কবর পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা।
* কবরে আযান দেয়া।
* জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।
* জানাযার নামাজের পর মুনাজাত করা।
* জানাযার পর মুর্দারের মুখ খুলে দেখা মাকরুহ।
* জানাযার পরে ও পূর্বে লোকটির ভাল হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা করা।
* মুর্দাকে কবরে নেওয়ার সময় তার পিছে উচ্চ স্বরে জিকর করা।
* মহিলাদেরে কবর যিয়ারতে উপস্থিত হওয়া।
* প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা।
* রসূল (স.) কে উপস্থিত মনে করে মীলাদে কিয়াম করা শির্ক।
* নামাজের পর বা কোন অনুষ্ঠানে সম্মিলিতভাবে উচ্চ স্বরে দরূদ পাঠ করা।
* সালাতুস তাসবীহের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।
* কোন নফল নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।
* শবে কদর বা শবে বারাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ নফল নামাজ পড়তে হবে বলে ধারণা করা এবং সে নামাজে নির্দিষ্ট সূরা পাঠ করতে হবে বলে ধারণা করা।
* শবে কদর বা শবে বারাতে নফল নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়া।
* শবে বারাতে হালুয়া-রুটি পাকান ও বন্টন করা।
* পীরকে সর্বজ্ঞ ধারণা করা ও তাঁর ধ্যানে মগ্ন হওয়া। এগুলো বর্তমানে শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।
* নবজাতক কে বরকতের জন্য পীরের কবর বা মসজিদ স্পর্শ করান।
* আশুরার দু দিন রোজা রাখা এবং সাধ্যানুযায়ী ভালো আহারের ব্যবস্থা করা ব্যতীত ঐ দিনের অন্য সকল কাজ।
* প্রচলিত নিয়মে খাতনার অনুষ্ঠান করা।
* পীরদের কবব প্রদক্ষিণ করা। এটিকে বৈধ মনে করে পালন করলে কাফির হয়ে যাবে।

***